# বঙ্গ কমলবার্তা

আগস্ট সংখ্যা। ২০২৫

ঝুঁকবে না মোদীর ভারত

## স্বাধীনতা দিবসে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা

আরও ৩টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রনে ভারত সফরে ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতি শ্রী ফার্দিনান্দ আর মার্কোস জুনিয়র।

মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০ তম বার্ষিকী উদযাপনে 'মাননীয় অতিথি' ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, সঙ্গে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি শ্রী মোহাম্মদ মুইজ্জুর।

ভারত-মালদ্বীপ সহযোগীতায় মালে-তে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি নতুন ভবন উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি শ্রী মোহাম্মদ মুইজ্জুর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।

স্যান্ড্রিংহ্যাম এস্টেটে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস-এর সঙ্গে আলাচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে আয়ুর্বেদ ও যোগ প্রসঙ্গ।

বঙ্গ
# কমলবার্তা
আগস্ট সংখ্যা। ২০২৫

**জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী** ৪

**বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে ফাঁপরে তৃণমূল** ৬
*বিনয় ভূষণ দাশ*

**অভয়ার রাজ্যে পৃথিবী বাংলাময়, বিচার অধরা** ৮
*স্বাতী সেনাপতি*

**বানভাসি ঘাটাল যেন খাটাল** ১০
*শুভ্র চট্টোপাধ্যায়*

**মুসলমান বাঙালি বা বাঙালি মুসলমানঃ অনেকটা যেন কাঁঠালের আমসত্ত্ব** ১২
*অনিকেত মহাপাত্র*

**স্বাধীনতা দিবসে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা** ১৬
*জয়ন্ত গুহ*

**ছবিতে খবর** ১৮

**মালেগাঁও বিস্ফোরণ: গেরুয়া সন্ত্রাস প্রমাণের এক ব্যর্থ চেষ্টা** ২৫
*সৌভিক দত্ত*

**অবশেষে বাম 'শাপ' মুক্ত: পাঠ্যপুস্তকে বিদেশী প্রভাব** ২৯
*দিব্যেন্দু দালাল*

**ট্যারিফের হুমকিতে ঝুঁকবে না নরেন্দ্র মোদীর ভারত** ৩২
*অভিরূপ ঘোষ*

**সম্পাদক:** জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
**কার্যনির্বাহী সম্পাদক :** অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
**সহযোগী সম্পাদক :** জয়ন্ত গুহ
**সম্পাদকমন্ডলী:**
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
**সার্কুলেশন:** সঞ্জয় শর্মা

## সম্পাদকীয়

বাংলা ও বাঙালীর সত্যি কি ভাগ্য! অন্য সব প্রদেশের কাছে তো ঈর্ষার বিষয় রীতিমত! এই বাংলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে পেয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে। আবার মহামহিম ফিরহাদ হাকিমকেও পেয়েছে মেয়র হিসাবে। এ নিয়ে আবার কেউ ভাববেন না যে নেতাজি-পেয়াজি বা মুড়িমুড়কি এক করে ফেলার উপমা টানা হচ্ছে। আরে বাবা ফিরহাদ তো বাঙালী। বাংলায় কথা বলে। হতে পারে হিজিবিজি, সৈয়দ মুজতবা আলি বেঁচে থাকলে হয়তো মূর্ছা যেতেন কিন্তু বাংলার মত কিছু একটা বলে তো! বাংলা ভাষা নিয়ে সরব হওয়া তার দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা তাদের নিজেদের দলের নাম বাংলায় বলতে গিয়ে স্বরচিহ্ন 'ঋ – কার' উচ্চারণ করতে পারেনা আর যত দোষ ফিরহাদের বাংলা 'উশ্চারনে'? এ বড় অন্যায়। তবে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে মেয়র হাকিম নিশ্চয়ই সমর্থন জানাবেন। কেননা তা নাহলে তার চেয়ার হয়তো একদিন দখল করবে বাংলা বলা কোনও বাংলাদেশী বা 'রোহিঙ্গা বন্দ্যোপাধ্যায়'। অবশ্যই ভোটার-আধার কার্ড নকল করে।

হয় হয়। সব হয় এই বাংলায়। নয়তো এই বাংলায় বসে আপনি কখনও ভেবেছিলেন মনসা পূজার পাশাপাশি আমেরিকারও গন্ধ পাবেন। কলকাতাকে লন্ডন বানাতে গিয়ে 'কেলগের সঙ্গে কোলাকুলি'-তেই সব শেষ হলেও, বাংলার মাটি-মানুষকে মমতাময়ী মা মানে বাংলার মাদার গডেস মানে বাংলায় যিনি ভক্তিতে না হলেও ভয়ে বঙ্গেশ্বরী নামে পূজিত- তার প্রবল হুমকিতে আমেরিকার হুমকিবাজ ট্রাম্পেরও নাকি কুচকিতে টান লেগেছে। দুজনের ক্ষেত্রেই একটা দারুন মিল আছে। দুজনেই তাদের নিজের নিজের ভাষা নিয়ে এমন চু-কিত-কিত খেলেন যে অনেকেই সেই ভাষা-ভাইরাস ভেসে গিয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুজনকে নিয়েই পৃথিবী জুড়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছেনা তাদের এই আপাত অনর্থক-অসাড়-বালকবালিকাসুলভ হুমকির হালুম হুলুমের উৎস কোথায়! মাথা না পেট? মাথা যে তাদের পরিষ্কার, মানে একেবারেই পরিষ্কার, কিসসু নেই তা অনেকদিন আগেই সবার কাছে পরিষ্কার। তাহলে উৎস কি পেট? ক্রনিক আমাশয় নাকি পেটগরমের থেকেই কি এই হালুম উঠে আসা! পরীক্ষা করলে হয়তো বা জানা যেত। কিন্তু তাতেও বিপত্তি। দুজনেরই নাকি জলের মত ব্রেন নেই মানে বেরেন নাকি দুজনেরই কিন্তু দেখতে মানুষেরই মত এবং যাত্রাপার্টির মাস্তান বা এলাকার ডন-দের মত কথায় কথায় হুমকি হামকা। লে হালুয়া। এবার? কি হবে? একমাত্র ভরসা প্রফেসর শঙ্কু। হতে পারে ওনারা দুজনেই এই পৃথিবীতে এসে আটকে পড়া ভিনগ্রহের এক মহাজাগতিক প্রাণ। এক্ষুনি ওদের ধরে মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা উচিৎ, বিজ্ঞানের স্বার্থে। টিকিট কেটে সবাই দেখতে যাব, সঙ্গে হরিদাসের বুলবুল ভাজা।

# জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

"ভারতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সঙ্গে রাশিয়ায় পুতিন সরকারের যে পরম বন্ধুর সম্পর্ক, তা কিন্তু আচমকা শুরু হয়নি। ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাশিয়া সফর। সেই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী ছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

২০১৭ সালে ভারত ও রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছিলেন - ১৯৪৭ থেকে প্রত্যেক ভারতীয় সরকারই রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। আমার সরকারও এই নীতিতেই বিশ্বাসী এবং একে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আমি প্রথম রাশিয়া এসেছিলাম। সে সফর আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। রাশিয়ার সাফল্য দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। দেশের ইতিহাস নিয়ে নাগরিকদের গর্বও লক্ষ্য করার মতো। এরপরও আমি বেশ কয়েকবার রাশিয়া এসেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি এখানকার মানুষের ভালোবাসা।

২০১৯ সালে ২০তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সময়ে সমাজমাধ্যমে অটলজীর সঙ্গে তাঁর এই ছবি পোস্ট করে শ্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছিলেন - আজ ২০তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সময়, আমার মনে পড়ল ২০০১ সালের নভেম্বরে অটলজি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের কথা। ওই সময়, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রতিনিধিদলের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত।"

“২০০১ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তার আগে ওই বছরেই ভারতের ৫৪তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে ১৫ আগস্ট শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।

এর আগে অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমন্ত্রনে ২০০০ সালের অক্টোবরে ভারত সফরে এসেছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন।

২০১৭ সালে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে স্মৃতিচারণায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখছেন- ১৯৯১-এর পর রাশিয়া বিশ্বে নিজের শক্তি ও প্রভাব বাড়িয়েছে। রাশিয়ার অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ঘটেছে এবং একটি নতুন প্রজন্ম তা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ২০০০ সালে ভারত ও রাশিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের চুক্তি সই করে। ২০১০ সালে আমরা নিজেদের সম্পর্ককে স্পেশাল ও প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে নিয়ে যাই।

২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফরের প্রাক্কালে, রাশিয়ার সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক মিখাইল গুসমান, বাজপেয়ী জী-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- দুই দেশের সম্পর্ককে আরও উন্নত করতে আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতটা গুরুত্বপুর্ণ?

উত্তরে বাজপেয়ীজী বলেছিলেন— রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে আমার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রায়শই দেখা হয়। প্রয়োজনে আমরা ফোনে কথা বলি। আলোচনা সবসময় খুব খোলামেলা হয়। কথা বলার সময় আমাদের মনে কোনও দ্বিধা থাকে না। তিনি আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধু যা আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় স্তম্ভ।”

# বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে ফাঁপরে তৃণমূল

**বিনয়ভূষণ দাশ**

**এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন হবেই; সাংবিধানিক এই প্রক্রিয়া রুদ্ধ করার ক্ষমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়া বাস্তবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করবে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে।**

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে গেল গেল রব উঠেছে। যেন কমিশনের এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের কারও নাম আর ভোটার তালিকায় থাকবে না, রাজ্যের নাগরিকদের সবাইকে ভোটার তালিকায় বাদ দেওয়া হবে। অন্তত রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সেই রকমই একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা করছে।

**একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার, ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন' কি?**

এসআইআর বা 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' হল ভোটার তালিকার এক বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া। এতে করে ভোটার তালিকা একেবারে সঠিক, ইনক্লুসিভ এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন প্রস্তুত হয়। এতে ভোটারদের নাম সংযোজন, বিযোজন করে তালিকা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করা হয়। এস আই আর হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিটি ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের নাম ও অন্যান্য তথ্য তথ্যানুসন্ধান করে সংশোধন করে বিএলও-রা তথ্য আপডেট করবেন। ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচক তালিকা সংশোধন করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ব্যবস্থাও করবেন কারণ লিপিবদ্ধ করে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচক তালিকা তৈরী, তত্বাবধান এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'-এর মাধ্যমে প্রস্তুত হবে সেই তালিকা যা অবৈধ ভোটার মুক্ত থাকবে, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বৈধ ভোটারদের নাম থাকবে, সমস্ত মৃত এবং স্থানত্যাগকারী ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে এবং কোন ভোটারের নাম আগে বাদ গিয়ে থাকলে তাঁর নামও যুক্ত হবে এবং তালিকাটি হবে সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত। যারা নির্বাচনী ক্ষেত্রের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা আবার ফিরে এসে থাকলে তাঁদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

এসআইআর-এ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' নীতিকে বাস্তবায়িত করতে পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। ফলে একই ব্যক্তির যাতে বিভিন্ন নির্বাচনী ক্ষেত্রে নাম না থাকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এতে করে ভুতুড়ে ভোটার মুক্ত হবে তালিকা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি ইত্যাদি বহুল প্রচলিত কার্ডগুলি এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেকেই ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপকহারে নাগরিকেরা বাদ যাবে বলে আশংকা করছেন। যদিও এই আশংকা বাস্তবসম্মত নয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা ভোটার ছাড়া আর কারও বাদ পড়ার শঙ্কা নেই।

**নির্বাচন কমিশন ১১টি নথির উল্লেখ করেছে যেগুলির যে কোন একটি থাকলেই এই সংশোধনীতে নাম তোলা যাবে। এই নথিগুলি হলঃ**

১। পৌরসভা, পঞ্চায়েত বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত জন্ম শংসাপত্র (Birth Certificate)

২। বিদেশ মন্ত্রণালয় দ্বারা জারী করা পাসপোর্ট

৩। স্বীকৃত কোন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্রিকুলেশন বা উচ্চশিক্ষার কোন সার্টিফিকেট ( Matriculation or Higher Education Certificate from a recognised board or university)

৪। সরকার কর্তৃক জারী করা পরিচয়পত্র বা পেনশন পেমেনট অর্ডার (কেন্দ্র/রাজ্য/ পি এস ইউ)

৫। জেলা মাজিস্ট্রেট বা অনুরূপ কর্তৃপক্ষের জারী করা স্থায়ী বাসস্থানের সার্টিফিকেট

৬। বন অধিকার আইনের অধীনে বন-অধিকার সনদপত্র

৭। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারী করা জাতিগত শংসাপত্র ( এস সি/ এস টি/ ওবিসি সার্টিফিকেট )

৮। এন আর সি ডকুমেন্ট ( যেখানে প্রযোজ্য)

৯। স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক জারী করা পারিবারিক নিবন্ধন ( registration)

১০। সরকারী অফিস থেকে জমি বা বাড়ি বরাদ্দের সার্টিফিকেট এবং

১১। ১৯৮৭ সালের আগে জারী করা কোন সরকারী অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র।

উপরোক্ত ১১ প্রমাণের যে কোন একটি থাকলেই হবে। প্রথমত, বলা হয়েছে ২০০২ সালে কৃত 'বিশেষ নিবিড় সংশোধনের' পরে তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম এবারের নিবিড় সংশোধিত তালিকায়ও থাকবে। তাঁদের কোন কাগজই দেখাতে হবে না। কাগজ দেখাতে হবে এর পরে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছিল তাঁদের, অর্থাৎ ২০০৩-২০২৫ এর মধ্যে। কিন্তু বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, জন্ম প্রমানপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতেই হবে। এটা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে আরও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী,

১। জুলাই, ১৯৮৭ এর আগে কোন ভোটার জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁকে শুধু উল্লিখিত এগারোটি ডকুমেন্টের একটি দিলেই হবে

২। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্যে যাঁদের জন্ম হয়েছে, তাঁদের দিতে হবে বাবা বা মায়ের ডকুমেন্ট যে কোন একটি। তবে এক্ষেত্রে ২০০২ সালে আমাদের রাজ্যে হওয়া শেষ এস আই আর এ যদি তাঁদের নাম থেকে থাকে তাহলে সেই লিস্টের পাতাটি দিলেই হবে, আর কোন নথি দরকার নেই।

৩। ২০০২ সালের পরে জন্ম নেওয়া ভোটার-

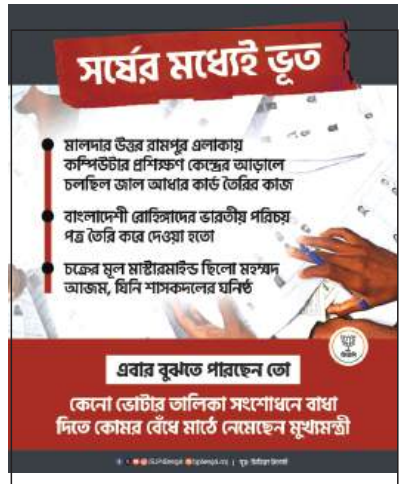

--- এঁদের ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের উভয়েরই নথি লাগবে। অবশ্য এক্ষেত্রেও ২০০২ সালের এস আই আরে তাঁদের নাম থাকলে সেই তালিকার পাতাটি জমা দিলেই হবে। কেউ যদি বাইরের রাজ্যে কর্মরত থাকেন তাহলে তিনি অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন।

সুতরাং অপপ্রচারে কারও কান দেবার প্রয়োজন নেই। যারা সঠিক ভারতীয় নাগরিক তাঁদের উপরোক্ত অনেকগুলি প্রমাণের মধ্যে একটি না একটি অবশ্যই থাকবে আশা করা যায়। সুতরাং তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। অবশ্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অথবা রোহিঙ্গাদের কোন প্রমাণ থাকার কথা নয়; তাঁরা এদেশের নাগরিক নয় কোনভাবেই, স্বাভাবিকভাবেই তালিকায় তাঁদের নাম উঠবে না, উঠতে পারেনা।

যে রাজনৈতিক দলগুলি এই এস আই আর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তাঁরা যে রাজ্যে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় নাম উঠিয়ে তাঁদের ভোটে অবৈধভাবে নির্বাচনে জিততেই এর বিরোধিতা করছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাদুর এম কে স্তালিন, বিহারের তেজস্বী যাদব বা উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব সেই একই পথের পথিক। আর সবার উপরে রয়েছে পালের গোদা রাহুল গান্ধী। অথচ বিভিন্ন সময়ে এঁদেরই রাজত্বে ১৩ বার এই ধরণের 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' হয়েছে। আমাদের রাজ্যে শেষ' বিশেষ নিবিড় সংশোধন' হয়েছে ২০০২ সালে। সেই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এর বিরোধিতা নয়, এই প্রক্রিয়ার সমর্থনে ভারতীয় সংসদে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু পাল্টে গেছে মত, বদলে গিয়েছে পথ! রাজ্যের বিশাল হিন্দু সমাজের সমর্থন তাঁর দিক থেকে সরে গেছে; সুতরাং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের ভোটার করে তাঁদের ভোটে জিততে চাইছেন মমতা!

তবে এবারে তাঁর এই আশা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা আদৌ নেই। রাজ্যে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন হবেই; সাংবিধানিক এই প্রক্রিয়া রুদ্ধ করার ক্ষমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়া বাস্তবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করবে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে।

# অভয়ার রাজ্যে পৃথিবী বাংলাময়, বিচার অধরা

**স্বাতী সেনাপতি**

**বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী, বাঙালি পুলিশমন্ত্রী, বাঙালি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলে, বাঙালি ডাক্তার মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চাইতে গিয়ে বাঙালির রাজ্যে পুলিশের হাতে আক্রান্ত হলেন মেয়ের বাঙালি বাবা মা। আর কতটা নিচে নামবে শাসক দল?**

৯ আগস্ট মেয়েটি ১৫ ঘন্টা ডিউটি শেষে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম নিতে গিয়ে তার চোখ লেগে যায় কিন্তু কে জানত সেই ঘুমই হবে তার জীবনের কাল ঘুম। সেই অভিশপ্ত রাতে যমদূতের মত ধর্ষকরা এসে তাঁকে ধর্ষণ করে এবং তাঁর প্রাণটাও নিয়ে নেয়। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে গোটা একটা বছর। তৃণমূল সরকারের অপদার্থতা এবং ষড়যন্ত্রের কারণে আজও বিচার পায়নি অভয়া। এটা শুধু একটা ধর্ষণ, গণধর্ষণ বা খুন তো নয়। এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক খুন, তারপর প্রমাণ লোপাটের মত ঘৃণ্য ঘটনা। আর মেয়ের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চাইতে গিয়ে যা ঘটল অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে সেটা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখল। রাস্তায় ফেলে মারা হল, ভেঙে গেল হাতের শাঁখা, মাথায় গভীর চোট নিয়ে ভর্তি হতে হল হাসপাতালে। অভয়ার বাবা-মার হাতে তো কোনো অস্ত্র ছিল না অথচ শাসক দল ভয় পেয়ে তাদের ওপর লোহার ব্যারিকেড, জল কামান, বড় বড় লাঠি দিয়ে নৃশংস আক্রমণ করেছে। এই অভিযানে তাদের সঙ্গে প্রায় ১০০ জন ছিলেন যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। শাসক দল তাদের কারোর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, তাদের কারোর পিঠ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

*মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চাইতে গিয়ে দলদাস পুলিশের হাতে মার খাচ্ছেন এক মা।*

বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী, বাঙালি পুলিশমন্ত্রী, বাঙালি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলে, বাঙালি ডাক্তার মেয়ের রেপ ও খুনের বিচার চাইতে গিয়ে বাঙালির রাজ্যের পুলিশের হাতে আক্রান্ত হলেন মেয়ের বাঙালি বাবা মা। এই তৃণমূল সরকার আজ একজন সন্তানহারা মায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর কতটা নিচে নামবে শাসক দল?

*মেয়ের বিচার চাইতে এসে পুলিশের অত্যাচারের শিকার মা।*

*বিচার চাই অভয়ার।*

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ইদানিং রোহিঙ্গা ভোট ব্যাংক বাঁচাতে বাঙালি বাংলা বিষয় নিয়ে বড্ড জল ঘোলা করছেন। বাংলাদেশী এবং বাঙালি গুলিয়ে দিতে চাইছেন। ছদ্ম বাঙালি যারা আরবি মেশানো জগা খিচুড়ি বাংলায় কথা বলে, যারা হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চায় তাদের জন্য প্রাণ একেবারে কেঁদে উঠছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অথচ বাংলার ঘরের মেয়েরা দিনের পর দিন ধর্ষিতা হচ্ছে, খুন হচ্ছে। কামদুনির মেয়েটি বাংলার মেয়ে ছিল না? সে বাঙালি ছিল না? সন্দেশখালির মা বোনেরা বাঙালি ছিল না? আরজি করের নির্যাতিতা বাঙালি নয়? তার মা বাবা বাঙালি নয়? অথচ তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কোনও অনুভূতি আছে? নেই। আসলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে হঠাৎ করে বড্ড বেশি বাঙালি হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আসুন দেখে নেওয়া যাক বাংলার মেয়েদের জন্য ঠিক কতটা ভাবেন মুখ্যমন্ত্রী?

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ এবং পকসো মিলিয়ে ৪৮,৬০০ কেস পড়ে রয়েছে। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা জেনে আশ্চর্য হবেন তার মধ্যে মাত্র ৬ টি পকসো কোর্ট আজকে অপরাশেনাল অর্থাৎ কার্যকরী অবস্থায় আছে। এবং ১১৭ টা কোর্ট এখনও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং পকসো কেসগুলি যদি এই কোর্টে না যায় তাহলে দিনের পর দিন বিচার পেতে দেরি হবে। আর এর জন্য একমাত্র রাজ্য সরকার দায়ী। ইতিমধ্যেই পুলিশের অপদার্থতার কারণে কড়েয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের দোষীরা হাসতে হাসতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। ঘটনাটা মনে নেই বোধহয়। তাহলে মনে করিয়ে দিই।

২০১৪ সালে কলকাতার কড়েয়ায় গাড়ির মধ্যে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়। তিনজনকে পুলিস গ্রেফতার করলেও অভিযুক্ত তিন জনকে বেকসুর খালাস করে দিল আলিপুর আদালত। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, যে গাড়িতে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল, তা বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টও সঠিক ভাবে আসেনি। সেই কারণে অভিযুক্তেরা বেকসুর খালাস পেয়েছেন। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তিনি উচ্চ আদালতে যাবেন। অভিযুক্তেরা জেল থেকে বার হলে তিনি আবার নির্যাতনের শিকার হতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই মেয়েটি কি বাংলার মেয়ে না? বাংলা ভাষায় কথা বলা ভারতীয় নাগরিক নয়?

আর শুধু ধর্ষণ, খুনের বিষয়েই কেন বলছি। ২৬ হাজার শিক্ষক আজ রাস্তায় বসে রয়েছেন। প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের উপরেও ঝুলছে বিপদ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখে বলছেন বাংলার বাইরে কাজ করছে ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। ৬৬০০ টির বেশি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। দেনার দায়ে ডুবে রয়েছে বাংলা। ৮২০০ এর উপর সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এই স্কুলগুলিতে তো বাংলাতেই পঠনপাঠন হয়। এত ছেলে মেয়ের ভবিষ্যত যে বিশ বাঁও জলে চলে যাচ্ছে এরা বাংলার সন্তান নয়? এরা বাঙালি নয়?

আমাদের বাঙালি জাতির সমস্যা হল আমরা প্রায়শই শত্রু চিনতে ভুল করি। কোনটা যে মুখ আর কোনটা মুখোশ চিনতে না পারলে বড্ড বিপদ। আপনাকে বাঙালি অবাঙালি ইস্যু দেখানো হচ্ছে যাতে পরিবর্তন আটকে দিয়ে আপনার বাঙালি মেয়ের সাথেও আগামীতে বাংলার আরজি কর টাইপের পরিস্থিতি করা যায়। যাতে আপনার হকের কাজ টা অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়ে আরও কিছুদিন ক্ষমতায় থাকা যায়।

আমাদের একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় চিরদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। কালের নিয়মে তৃণমূল দলটাও আজীবন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকবে না। কিন্তু নিজের ক্ষমতার স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে বাঙালির যে সর্বনাশটা তিনি করছেন তার ফল বাঙালি জাতিকে আজীবন ভুগতে হবে।

# বানভাসি ঘাটাল যেন খাটাল

## বিজেপিই করবে মাস্টার প্ল্যান, আশ্বাস বিরোধী দলনেতার

**শুভ্র চট্টোপাধ্যায়**

**উল্টে দেখুন। পাল্টে গ্যাছে! বানভাসি ঘাটাল আর ঘাটালে নেই। এ যেন 'দ্যাব'-তার খাটাল। শহরজুড়ে খাবি খাচ্ছে মানুষ। উঠছে নাভিশ্বাস। আর তারই মাঝে নিশ্চল-নির্বিকার 'খাটাল-দেব'। ধেয়ানে মগ্ন। মমতাময়ী দেবীর ধ্যানে। তিনি এসে নাকি জলে পা ভেজালেই ওই জল চরণামৃত হয়ে উঠবে। খাটাল নাকি আবারও ঘাটাল হয়ে উঠবে। জয় 'খাটাল-দেব'-এর জয়।**

প্রতিবছরই বন্যার জলে ডুবে যায় ঘাটাল। বছরে এক-দু'বার এই অঞ্চলে বন্যা হওয়া এখন স্বাভাবিক ঘটনা। অনেকের মতে, ঘাটাল ভূগঠনের দিক থেকে যেন একটি বাটির মতো—ফলে আশেপাশের নদীগুলোর জলস্ফীতি ঘটলেই এই এলাকায় জল জমে থাকে দীর্ঘদিন। ফলে প্রতি বছরই ঘাটালকে বন্যার প্রকোপে ভুগতে হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরের এক প্রান্তে অবস্থিত ঘাটাল শহর এবং তার আশপাশের বেশ কিছু পৌর ও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও বর্ষায় প্লাবিত হয়। তখন মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে নৌকা। স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে—বন্ধ হয়ে যায় স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কাজকর্ম।

ঘাটাল অঞ্চলের ভূমি নিচু হওয়ায় প্রতি বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, রূপনারায়ণ নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এবং শিলাবতী নদীর সঞ্চালনক্ষমতা অপর্যাপ্ত হওয়ায় জল দ্রুত নামতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে রূপনারায়ণে ড্রেজিং এবং শিলাবতীতে জল সঞ্চালনের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উঠেছে। ইতিমধ্যে একটি নতুন খাল খননের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে শিলাবতীর অতিরিক্ত জল কংসাবতী নদীতে চালিত করা যায়। পাশাপাশি, দুর্বল বাঁধগুলিতে গার্ডওয়াল নির্মাণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

বর্ষার সময় ঘাটালে নৌকাই হয়ে ওঠে একমাত্র যানবাহন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাংসদ দেবের (দীপক অধিকারী) বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "ঘাটালের তিনবারের সাংসদ দীপক অধিকারী, যিনি ভোটের সময় আসেন এবং বলেন 'আই লাভ ইউ', তিনি দেশের

সবচেয়ে অনুপস্থিত সাংসদদের মধ্যে একজন।"

ঘাটালবাসীকে আশ্বস্ত করে শুভেন্দুবাবু আরও বলেন, "সিপিএম ৩৪ বছরে পারেনি, তৃণমূল ১৪ বছরেও কিছু করেনি। ২০২৬ সালে বিজেপিকে সুযোগ দিন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরাই বাস্তবায়ন করব।"

টানা প্রবল বর্ষণের ফলে এখনও ঘাটালের বিস্তীর্ণ অংশ জলের নিচে। প্রতিদিনের মতোই মুষলধারে বৃষ্টির কারণে শহর ও আশেপাশের গ্রামীণ এলাকায় জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লাবিত এলাকা থেকে জল নামার কোনো লক্ষণ নেই। এরই মধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে পানীয় জলের সংকট।

সাধারণ মানুষ নিতান্ত বাধ্য হয়ে ডিঙ্গি বা ছোট নৌকায় চেপে বহু দূর থেকে পানের উপযোগী জল সংগ্রহ করছেন। কোথাও আবার জল পাম্প করে আনতে হচ্ছে, তাও সব জায়গায় পৌঁছচ্ছে না। অনেক এলাকায় এখনই পানীয় জলের ভরসা বলতে অস্থায়ী ট্যাঙ্কার বা সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা।

ঘাটাল পুরসভার ১২টি ওয়ার্ড এবং ঘাটাল ব্লকের অন্তত আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্লাবিত। এসব এলাকায় বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট, কৃষিজমি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জলের নিচে। কোথাও ছাদ পর্যন্ত উঠে এসেছে জল। বহু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে রাস্তার ধারে বা অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে।

সড়কপথ কার্যত অচল। শহরের রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে চলছে সরকারি নৌকায় যাত্রী পারাপার। অনেক এলাকায় একমাত্র যানবাহন এখন নৌকা। যাতায়াত, বাজার-সদাই, স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছনো—সবকিছুই এখন নির্ভর করছে ডিঙ্গি বা সরকারি নৌকার উপর।

এই চরম দুর্ভোগের মধ্যে প্রশাসনের তরফে কিছু ত্রাণসামগ্রী ও নৌকা সরবরাহ করা হলেও তা মোটেই যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘমেয়াদে কোনো টেকসই সমাধানের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছরই তাদের এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, প্রতিদিনই হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির ফলে জলস্তর আরও বাড়ছে। লক্ষাধিক মানুষ নৌকা ও ডিঙ্গির ওপর নির্ভর করে যাতায়াত করছেন। প্রায় দুই মাস পার হলেও বন্যার জল এখনও নামেনি। প্রতিদিনের জীবন যেন রীতিমতো জলের সঙ্গে যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ এই দুর্ভোগে এখন চূড়ান্তভাবে ক্লান্ত। কবে স্বস্তি মিলবে, তা কেউ জানে না।

*ঘাটালের রথতলা থেকে চাউলি রাস্তা।*

এর মধ্যেই ঘাটালবাসীর উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে নতুন করে দেখা দেওয়া বন্যার আশঙ্কা। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ঘাটাল ও আশপাশের অঞ্চলের নদ-নদীগুলির জলস্তর আবারও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, শিলাবতী ও ঝুমি নদীতে জল দ্রুত বাড়তে থাকায় ইতিমধ্যেই ঘাটাল পৌরসভার সমস্ত ১২টি ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, নদীগুলির এই জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি জলাধারগুলি থেকেও যখন-তখন জল ছাড়া হতে পারে, সেই সম্ভাবনাও এখনকার সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে প্লাবিত এলাকার সংখ্যা ও ব্যাপ্তি আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

শুধু ঘাটাল নয়, পাশের অঞ্চলগুলিও একই দুর্ভোগের শিকার। চন্দ্রকোনা ওয়ান, চন্দ্রকোনা ২, দাসপুর ও কেশপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাও বন্যার জলে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা জলের তলায় চলে যাচ্ছে, আর এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ঝুমি নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলেও এখনও বহু গ্রাম সেই নদীর প্লাবনে জর্জরিত। বেশ কিছু এলাকা দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। বহু বাড়ি এখনও জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে, যেখানে নৌকা বা ডিঙ্গি ছাড়া যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

জলের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা এই মানুষগুলোর সামনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে—পানীয় জলের সংকট, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, শিশুদের স্কুলছুটি, এবং সবচেয়ে বড় কথা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়।

ঘাটালবাসীর একটাই প্রশ্ন—এই দুর্দশার শেষ কোথায়? আর কত বছর এভাবেই তাদের বাঁচতে হবে?

সাংসদ দেবের ঘাটাল সফরের আগে শহরজুড়ে বিজেপি কর্মীরা পোস্টার সাঁটিয়ে প্রতিবাদ জানান। দেব ও রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে ঠগবাজ বলে তীব্র আক্রমণ করা হয়। পোস্টারে প্রশ্ন তোলা হয়—ঘাটাল যখন বারবার বন্যায় ভাসছে, তখন কেন দেখা গেল না সাংসদকে? পাশাপাশি, সেচমন্ত্রীর পদত্যাগেরও দাবি তোলে বিজেপি।

বিজেপির বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, "ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের নামে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করছে সরকার। আমরা পোস্টারের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেছি—এবছর ঘাটালে প্রায় তিন থেকে চারবার বন্যা হয়েছে, অথচ একবারও মানুষের পাশে দাঁড়ালেন না সাংসদ? একবারও খবর নিলেন না?"

# মুসলমান বাঙালি বা বাঙালি মুসলমান

## অনেকটা যেন কাঁঠালের আমসত্ত্ব

অনিকেত মহাপাত্র

**যাঁরা দ্বিধায় আছেন কিংবা থাকতে চান অর্থাৎ থাকলে সুবিধে তাঁরা থাকুন। কিন্তু বাস্তব একেবারেই আলাদা। আপনারা মীর মোশাররফ হোসেন-এর লেখা পড়ুন। পড়ুন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-কে। বুঝতে পারবেন বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক। যে বিতর্ক আজও মেটে নি। আর মিটবার সম্ভাবনাও নেই। কারণ সোনার পাথরবাটি যেমন হয় না; তেমনই হয় না কাঁঠালের আমসত্ত্ব! তেমনই অসম্ভব মুসলমান বাঙালি বা বাঙালি মুসলমান।**

শুরু করা যাক একেবারে শেষের কথা দিয়ে। 'স্ক্রিন টাইম'-এর সঙ্গে জুড়ে যাওয়া মন কখন উড়ে যায় তার ঠিকানা নেই!

বাংলা' শব্দটি হল একটি 'স্ট্র্যাটেজিক টুল'। এই শব্দটির পেটেন্ট যদি নিয়ে নেওয়া যায় অর্থাৎ বিশ্ব-সমাজ যদি 'বাংলা'র ওপর বাংলাদেশের বা বাংলাদেশীদের দাবিকে আপাত বৈধতাও দেয় তবে পরোক্ষভাবে 'বে অব বেঙ্গল' অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের ওপর বাংলাদেশের দাবিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই বিষয়টি বাংলাদেশের মাথায় এবং অবশ্যই 'ডিপ স্টেট'-এর স্মরণে রয়েছে। তাই মুহাম্মদ ইউনুস চিনে গিয়ে বলতে পেরেছিলেন 'উই আর দ্য গার্ডিয়ান অব বে অব বেঙ্গল'। যতদিন যাবে সূত্রটি আরও বলবান হবে। পাকিস্তান যখন পূর্বেও ফ্রন্ট খোলার কথা ঘোষণা করেছে। সঙ্গে দোসর আমেরিকা। ফলে ছলের যে কোনও অভাব হবে না এই ব্যাপারে নিশ্চিত।

অন্তত এই নিরিখে জাতীয় স্বার্থে, নিজের নিজের পৃথক ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে সরিয়ে রেখে বাংলা ও বাঙালি বিষয় দুটির থেকে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশীকে আলাদা রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার চালাতে হবে। জাতীয় সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম এমনভাবে বিষয়টিকে তুলবে যে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম বাধ্য

হবে এটি নিয়ে খবর করতে; ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক। কোন ধরনের খবরের কী অভিঘাত তা না ছড়ালে টের পাওয়া যায় না। অনেক সময়' নেতিবাচক' খবর বেশি অভিঘাত তৈরি করে।

পুনরায় আখ্যানে আসা যাক একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা দিয়ে। এক অধ্যাপকের সূত্রে পরিচিত হওয়া গেল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহরের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর নাম শেখ আকবর। তাঁর বড়ো ছেলের একটি পাঠ্য বিষয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। তাতে সাহায্য করতে হবে মাস তিনেক। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ওইদিন তাঁদের বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন। অগত্যা যেতে হল। কথা হচ্ছিল বাংলা ভাষাতেই। পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছিলেন শেখ আকবর। যেতে যেতে বললেন আমাদের বাড়িতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না, আমার স্ত্রী বাঙালি। শেখ আকবর-এর পরিবারের সবার সঙ্গে এই মাস তিনেকে আলাপ হল। সন্তানদের ডাক নাম হিন্দুভাবাপন্ন। পোশাকি নাম ইসলামীয়। আলাপ হয়েছিল তাঁর বাবার সঙ্গে। অনেক গপ্পো হল। তাঁর বাংলা উচ্চারণও মান্য চলিত। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ আকবরবাবুর বিমাতাও হিন্দু ছিলেন একদা। শুধু তাই নয় আকবরবাবুর কাকার এক স্ত্রীও ছিলেন হিন্দু। সেই ভদ্রমহিলা নিজের প্রথম বিবাহজাত হিন্দু কন্যাকে হিন্দু পরিচয়ে নিজের কাছে বড়ো করছেন। আমি ব্যবহার করলাম 'হিন্দু' শব্দটি কিন্তু শেখ আকবর ব্যবহার করেছেন আমাদের জন্য 'বাঙালি' শব্দটি। আর নিজেদের জন্য অবশ্যই মুসলিম বা মুসলমান। বাঙালির ভাষা এবং কিয়ৎ বাঙালি সংস্কার পূর্বাশ্রম সম্পর্কিত সূত্রে পরিবারের পরিসরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু মূল কাঠামো এবং তার অন্তর্বস্তু যে ইসলামীয়, তা নিয়ে শেখ আকবর-এর কোনও দ্বিধা নেই।

যাঁরা দ্বিধায় আছেন কিংবা থাকতে চান অর্থাৎ থাকলে সুবিধে তাঁরা থাকুন। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়! যখন যুক্তি অক্ষম, লক্ষ্য মিথ্যার চাষ কিংবা অর্ধসত্যের বিপণন তখন একটাই কাজ কিছুজন করে সচেতনভাবে: কনফিউজ করো, আরও কনফিউজ করো!

আপনারা মীর মোশাররফ হোসেন-এর লেখা পড়ুন। পড়ুন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-কে। বুঝতে পারবেন বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক। যে বিতর্ক আজও মেটে নি। আর মিটবার সম্ভাবনাও নেই। কারণ সোনার পাথরবাটি যেমন হয় না; তেমনই হয় না কাঁঠালের আমসত্ত্ব! তেমনই অসম্ভব মুসলমান বাঙালি বা বাঙালি মুসলমান। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের মধ্যেও কিছুটা এই বিতর্কের সন্ধান পাবেন।

অনেকে যে বিষয়টি ভুলে যান প্রায়শ , 'জল' তার সবচেয়ে বড় নির্ধারক । উত্তর ভারতে অবস্থানকারী হিন্দু কিংবা নিদেনপক্ষে পার্শ্ববর্তী ওড়িশার হিন্দুরাও 'পানি' বলেন কিন্তু বাঙালির কাছে তা 'জল'। বাংলায় বসবাসকারী মুসলমান কেন 'পানি' বলেন , সেটি আগে স্থির করুন তারপর 'বাঙালি' পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বড়ো বড়ো কিংবা বিখ্যাত সব শিল্পীদের চিত্রকে শিল্প-সমালোচকরা চেনেন কিছু কিছু নিজস্ব মোচড়ে, টানে কিংবা বিশেষ কোনও 'প্যাটার্ন'-এ। বাঙালিকেও চেনা যায় যেমন উৎসবে-পার্বণে তেমনই এইরকম টানে। একটি জনগোষ্ঠী কাকে বলে তার সংজ্ঞার্থ অনুধাবন করলে ভুল বোঝা বা বোঝানোর কোনও অবকাশ থাকে না।

আসলে বাঙালি একটি আত্মঘাতী জাতি। আর তার সর্বনাশ সর্বাধিক করেছে ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ সহ উচ্চ-বর্গীয়রা। তাঁরা নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের হিন্দু-সমাজে ধরে রাখতে পারেন নি। পারেন নি কোনও রূপরেখা তৈরি করতে, যাতে চলে যাওয়া হিন্দুরা সহজে ফিরে

আসতে পারেন। বরং সমাজে কীভাবে না প্রবেশ করতে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয় অবতারে তাঁরা জমিদারের রূপ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাঁদের বংশধরেরা নায়েব, গোমস্তাদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বিলাসবহুল জীবনে গা ভাসিয়েছেন আর সাংস্কৃতিক-চর্চা করেছেন, শুধুমাত্র লক্ষ রেখেছেন যাতে জমিদারি থেকে টাকাটা ঠিক মতো আসে। কোনও দায় ছিল না তাঁদের মানুষের প্রতি, ধর্মের প্রতি। পরবর্তী অবতারে তাঁরা জীবনে উত্তেজনা আনার জন্য হয়ে গেলেন 'কিমলিস'। বাঙালির অস্তিত্বের বারোটা বাজানোর কাজ এই অবতারে প্রায় সম্পূর্ণ করলেন। অধুনা তাঁরা রূপ নিয়েছেন 'সেকু-লেবু'র। বাঙালির সর্বনাশ ঘটানোর বাকি কাজটা এই অবতারে সারবেন বলে পণ করেছেন। আগের অবতারগুলির কারণে নিজের মানুষ পর হয়ে গেছে। পরিণত হয়েছে শত্রুতে। ফলস্বরূপ বাঙালির নিজস্ব ভূখণ্ডের একটি বৃহৎ অংশ হাতছাড়া হয়েছে।

"সই! কেমনে ধরিব হিয়া?/
আমার বঁধুয়া,/আন বাড়ি যায়,/
আমার আঙিনা দিয়া!/
সে বঁধু কালিয়া,/ না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?"

এই সন্ধান কারোর মধ্যে দেখা যায় নি। খোঁজ মেলে নি কোনও মমত্ববোধের।

'কিমলিস' অবতার থেকে তাঁদের পণ 'বাঙালি' পরিচিতির ধ্বংস। তাই বাঙালির একান্ত গৃহকোণের পূজা-সাধনাকে পরিণত করেছেন সামাজিক উৎসবে ও মদ্যের সুপ্রচুর সেবনের বারোয়ারিতে। এবার তাঁরা মেতেছেন বাঙালির পরিচিতি কেড়ে নিতে। এটাই ভাবনার ও লজ্জার কথা যে সুনীল, শীর্ষেন্দু কিংবা দেবেশ বা অবোধ-রা বা তাঁদের পূর্ব-পুরুষ জিহাদিদের দ্বারা অত্যাচারিত ও ভীত হয়ে এই ভারতে প্রায় এক-কাপড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে এক সাবলীল ভণ্ডামি। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' উপন্যাসে যোগেন্দ্রনাথ দেবেশবাবুর আখ্যান থেকে বেরিয়ে গেলেন পদত্যাগপত্র লেখার আগেই। খুব তাড়া ছিল তাঁর? তাড়া হিল দেবেশবাবুর নিজের পিঠ বাঁচানোর নাকি এজেন্ডা বাঁচানোর জন্য? বাঙালি জাতিসত্তাকে গুলিয়ে ফেলার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে এই কলকাতায় বসে। যে কলকাতা ছিল ভারতে। যে ভারতে তিনি থাকতে চান নি প্রাণপণে! এ যে হিন্দুর ভারত! ভাগ্যের কী পরিহাস সেই হিন্দু-ভারতে না এলে তাঁর প্রাণ-সংশয় ছিল তাঁর সাধের পাকিস্তানে। অথচ দেবেশবাবুর উপন্যাসে আপনি পাবেন যোগেনবাবু 'বর্ণহিন্দু'-র থেকে নিজে বিপন্ন বোধ করছেন। শ্রী প্রমথ ঠাকুর কিন্তু এই 'বাঙালি' জাতিসত্তাকে গুলিয়ে ফেলার ভুল করেন নি। শেখ আকবর-রা যা সহজে বোঝেন, যোগেন বাবু কিংবা পরবর্তী সময়ে ইলা মিত্ররা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েও বোঝেন নি। কিংবা বুঝেছেন কিন্তু তাঁরা যে চশমা পরে থাকেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মানুষকে 'কমফিউজ' করে গেছেন এজেন্টদের মতো। আর বাঙালি লেখক, সংস্কৃতিকর্মী আর বুদ্ধিজীবীরা বই বাজার আর ইলিশের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন।

পাকিস্তান-পন্থা অবলম্বন করে বাঙালি হওয়া সেটি কেমন? আসলে একটি বিমান যেভাবে অপহৃত হয়। সেইভাবে 'বাঙালি'

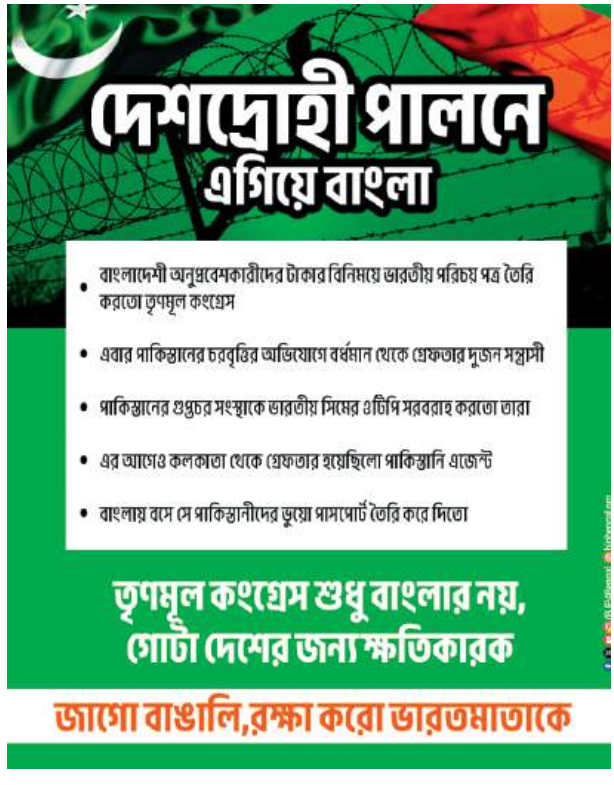

জাতিসত্তা বিষয়টি 'হাইজ্যাক' হয়ে গেছে। অন্তর্ঘাতের কাজে লিপ্ত থেকেছেন হিন্দু অর্থাৎ বাঙালি পদবিধারী কিছু লোক। তাঁরা বিকিয়ে গেছেন অন্ধত্বের কাছে কাঞ্চনের মূল্যে। কিংবা আরও কিছুর জন্য। হাইজ্যাকার-রা হলেন সেই লোক যাঁরা জানেন 'বাঙালি' পরিচিতির ওপর অধিকার কায়েম করতে পারলে দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাংলাভাষার জন্য প্রতিষ্ঠিত চেয়ারগুলি তাদের দখলে আসবে। গুগল বাংলা-ভাষা বিশারদ চাইবে বাংলাদেশের কাছে। আসবে অনেক অনেক গ্রান্ট। শুধু তাই নয় তাঁরা জানেন যদি বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হয় তবে অনেক অনেক সংখ্যক মেধা দেশ ছাড়বে তাঁদের জায়গায় আসতে পারবেন তাঁরা। যারা গণহত্যা করে তাদের কিছুজন ইউনুসের মতো লোক, যাঁরা সামনের সারিতে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত 'আলোকিত' মানুষ থাকেন পর্দার আড়ালে। অধিকাংশ যে সব লোক এই কাজগুলির সামনের সারিতে থাকেন, তাঁরা তো 'হাত মে লুটা, মুহ মে পান, লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। হিন্দু-শূন্য করে দিলে তাঁদের যে খুব লাভ এমনটা নয়, তাঁরা করেন ফোকটে কিছুটা 'নেকি হাসিল' করার জন্য। মন্ত্রী হন, আমলা হন, অধ্যাপক হন, বুদ্ধিজীবী হন সেইসব মানুষ যাঁরা হাতিটা মরার অপেক্ষা করেন 'ভদ্রভাবে'। ক্লান্ত এবং লুম্পেনদের সরিয়ে সযত্নে শাঁসের ভাগ নেন। এই শ্রেণি আরও সাংঘাতিক। আবার এদের দেখেই অনেকের মধ্যে 'বাঙালি' বিষয়ক ভ্রমের উৎপত্তি হয়। এই প্রসঙ্গে গোলাম মোস্তফা, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আল মাহমুদদের কথা বলতেই হয়। রয়েছেন ছফা, সলিমুল্লাহ, মাজহাররা। নোবেলজয়ী ইউনুস অবশ্যই অগ্রগণ্য। আর অন্তর্ঘাতের কাজ করেন ডলার সাম্রাজ্যের সেইসব চাকুরে যাঁরা ইনসেনটিভ বা এডভান্স হিসেবে পান নোবেল, পুলিৎজার বা ম্যাগসাইসাই!

এইবার মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-র একটি উক্তি তুলে ধরব। তারপর তুলে ধরা হবে আর এক পাকিস্তানপন্থী কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গে 'কে বড়ো মোচলমান' এই বিষয়ক একটি বিতর্কে শহীদুল্লাহ-র আত্মপক্ষ-সমর্থনের ভাষা।

"সমালোচকের জানা উচিত কাহারও ওপর কুফরী ফতোয়া দিলে সে যদি প্রকৃত কাফির না হয়, তবে ফতোয়াদাতাই কাফির হইবেন, ইহাই ওলামা সমাজের অভিমত। আমি পাকিস্তানের মতবাদকে ইসলামী মতবাদেরই আদত বলিয়া মনে করি। কাজেই কোনও মুসলমান পাকিস্তানের মতবাদের বিরোধী হইবে ইহা ধারণাই করিতে পারি না।"

পাকিস্তান কী? পাকিস্তানের পক্ষের মানুষদের জাতিসত্তা কী? এই নিয়ে যদি কারোর কোনও পরিষ্কার ধারণা না থাকে তাহলে পাকিস্তানের এখনকার ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির-এর সেই বহু চর্চিত বক্তব্যটি শুনুন যা তিনি প্রবাসী পাকিস্তানিদের উদ্দেশে বলেন। সব ভুল ধারণা দূর হবে। এই বাংলাদেশ তো আর কিছু নয়, পূর্ব পাকিস্তান। মূল সুর একই! মুজিবুর রহমান-কে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের 'ডিপ স্টেট' ক্ষমতার ভাগ দিত তাহলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পরিসর ও পরিস্থিতি তৈরি হবার সম্ভাবনা কম ছিল।

"আমি নাকি আগে বাঙালি পরে মুসলমান, এইরূপ মত প্রচার করিয়াছি। তিনি কি আমার অসংখ্য লেখা হইতে এইরূপ কোনও উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারেন? আসল কথা আমি আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে আমরা বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ ধর্ম্মে ও আচারে পৃথক হইয়াও আমরা ভাষাভাষী হিসাবে বাঙালী। সমালোচক ইহারই কদর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক এবং যাঁহারা আমাকে ঘরে বাহিরে জানেন তাঁহারাই ভালভাবে জানেন যে আমি কীরূপ মুসলমান, আমার আকিদা এবং আমার আমল কী রূপ। আমি শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে আলহামদুলিল্লাহ। আমি সমালোচক হইতে কোনও অংশে কম মুসলমান বা পাকিস্তানি নই।"

দুটি রাস্তা আলাদা! একসঙ্গে চলে না, এমনকী সমান্তরালেও চলা এদের অসম্ভব। ঠিক যেমন করে ১৯৭১ এবং ২০২৪ আলাদা; দুটি-ই ঘটেছে বাংলাদেশে। দুটিকেই যুগান্তর বলছেন কেউ কেউ! অন্তত ফ্রান্সে লুকিয়ে থাকা ভাঁড় পিনাকী কিংবা কোবরা কুমন কিংবা ভোঁদড়-দেবারা কিংবা ঘষটেদাররা গলা ফাটিয়েছেন ২০২৪-এর জন্য। যারা পণ করেছেন 'সেভেন সিস্টার' উপহার দেবেন, দেবেন তুলে বঙ্গোপসাগর মহাজনের হাতে। আর যেটা তাঁরা বলছেন না স্পষ্টভাবে তা হল 'বাঙালি অস্মিতা' নামক ডুবো জাহাজটিকে ভিড়িয়ে দিতে চান সেন্ট মার্টিনের কাছে। যাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে পূর্ব পাকিস্তানি জেহাদি ও লালমুখোরা; সেই ভোজে ডাক পাবেন নোবেলতলার নেড়েরা।

# স্বাধীনতা দিবসে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা

**জয়ন্ত গুহ**

**''অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে...সীমান্ত এলাকায় জনবিন্যাসে পরিবর্তন জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে সংঘর্ষের বীজ বপন হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের সামনে কোনও দেশ মাথা নত করতে পারে না'' – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।**

অনুপ্রবেশকারীদের চলে যেতে হবেই। চলে যেতে হবে এদেশ ছেড়ে। কোনভাবেই তাদের থাকতে দেওয়া হবেনা ভারতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক দল তৃণমূল এবং জাতীয় স্তরে তার জোটসঙ্গীদের জন্য একেবারে পরিষ্কার বার্তা দিয়ে দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর সেই বার্তা দিলেন দলের হেডকোয়ার্টার বা জনসভা থেকে নয়, বার্তা দিলেন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে।

লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, "আমি একটা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে দেশের মানুষকে সতর্ক করে দিতে চাই। সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই দেশের জনবিন্যাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। নতুন নতুন সমস্যার বীজ বপন করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের মা-বোনেদের নিশানা করছে। এটা সহ্য করা হবে না।"

গত কুড়ি বছর ধরে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে কিভাবে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা দখল নিচ্ছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদার ব্যবসা-বানিজ্য এবং শাসকদলের রাজনীতিতে। দার্জিলিং থেকে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দঃ ২৪ পরগণা থেকে বীরভুম-আসানসোল-হাওড়া-হুগলী সর্বত্র দখল নিচ্ছে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ৭০-৮০ শতাংশই বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। ফেক আধার-ভোটার কার্ড নিয়ে এরা দিব্যি মিশে যাচ্ছে ভারতীয় জনগণের মধ্যে। জাতীয় নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "সীমান্ত এলাকায় জনবিন্যাসে পরিবর্তন জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে সংঘর্ষের বীজ বপন হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের সামনে কোনও দেশ মাথা নত করতে পারে না। আমরা কী ভাবে করব? আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গিয়েছেন। অনুপ্রবেশকারীদের রুখে তাঁদের প্রতি কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে।''

এই অনুপ্রবেশকারীরা গত ২০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এবং ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসী এলাকায় দ্রুত বদলে দিয়েছে জনবিন্যাস। এ নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা, "এই অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। তাঁদের ভুল বোঝাচ্ছে। দেশ এটা সহ্য করবে না।"

দেশের সুরক্ষায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দেশবাসীর জন্য নতুন 'উপহার' ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

জিএসটি পরিকাঠামোয় বদল আসছে দীপাবলিতে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "এ বারের দীপাবলি আমি আপনাদের জন্য দ্বিগুণ আনন্দের করে দিচ্ছি। এই দীপাবলিতে দেশবাসী একটি বড় উপহার পাবেন। আমরা নতুন প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার আনছি। এর ফলে সারা দেশে করের বোঝা কমবে। দীপাবলির আগে এটিই হবে উপহার।" ইতিমধ্যেই জিএসটি ব্যবস্থায় সরলীকরণ আনার জন্য কাজও শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র। জিএসটি পরিকাঠামোয় যে বদল আসতে পারে, গত জুলাইয়েই মিলেছিল সেই আভাস।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সিন্ধু জলচুক্তিকে সম্পূর্ণ 'একপেশে' এবং 'অন্যায্য' বলে ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, "ভারতের নদীর জল আমাদের শত্রুদেশের চাষের খেতে যাচ্ছে, অথচ আমাদের দেশ, দেশের কৃষকেরা জল পাচ্ছেন না। এই চুক্তি গত সাত দশক ধরে দেশের কৃষকদের অকল্পনীয় ক্ষতি করেছে। এখন থেকে এই জলের উপর অধিকার থাকবে শুধুমাত্র ভারতের কৃষকদের।" সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে এই বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান এবং আমেরিকা, দুই দেশকেই

একটা জোরালো বার্তা দিলেন, পাকিস্তানের হুমকিতে ঝুঁকবে না ভারত। পাকিস্তান যদি আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে হুমকি দেয় তাতেও ঝুঁকবে না ভারত।

সম্প্রতি পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে সিন্ধুচুক্তি স্থগিত রাখা নিয়ে হুমকি দিয়েছিল ভারতকে। ব্যর্থ ও পরাজিত সেনাপ্রধান মুনির হুমকি দিয়েছিল, "ভারত বাঁধ তৈরি করুক, আমরা অপেক্ষা করব। যখন বাঁধ তৈরি করা হয়ে যাবে, আমরা ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে সেই বাঁধ ধ্বংস করে দেব।" আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের ওই মন্তব্যের পর পরই পাক বিদেশ মন্ত্রকও এক বিবৃতিতে সিন্ধু চুক্তি পুনরায় কার্যকর করার জন্য ভারতকে অনুরোধ করেছিল। চিড়ে ভেজেনি তাতে। এবার লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন যে ভারত তার অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরবে না।

## ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর প্রতি শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা

১। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশের যুবকদের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, তারা আমাদের বোন ও কন্যাদের লক্ষ্যবস্তু করছে, এটা সহ্য করা হবে না।

২। স্বাধীনতার এই মহান উৎসব ১৪০ কোটি মানুষের সম্মিলিত সাফল্যের গর্বের মুহূর্ত।

৩। ভারতের কৃষক, গবাদি পশুপালক এবং মৎস্য পালনকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও ক্ষতিকারক নীতির বিরুদ্ধে মোদী প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

৪। ২০৪৭ সালের মধ্যে পারমাণু শক্তি ১০ গুন করার লক্ষ্য।

৫।দেশের তরুণদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা,আমি তোমাদের সাথে আছি। এসো, সাহস সঞ্চয় করো, উদ্যোগ নাও, এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গী হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত।

৬। কোটি কোটি মানুষ বলিদান দিয়েছিল স্বাধীন ভারতের জন্য, আজকের প্রজন্ম সংকল্প নিক সমৃদ্ধ ভারতের।

৭। দীপাবলীতে দেশবাসীর জন্য উপহার নতুন প্রজন্মের জিএসটি।

৮। ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা চালু।

৯। অপারেশন সিঁদুর দেশবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

১০। সিন্ধুর জলচুক্তিতে অধিকার থাকবে একমাত্র ভারতীয় কৃষকদের।

১১। শত্রুদমনে চালু হচ্ছে 'মিশন সুদর্শন চক্র'

১২। দেশীয় পন্যে 'দাম কম, দম বেশী' মন্ত্রে জোর।

১৩। ভারতেই যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির লক্ষ্য।

১৪। চলতি বছরের শেষেই ভারতের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর চিপ বাজারে আসবে।

বর্তমানে রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারত-আমেরিকা কূটনৈতিক টানাপড়েনের আবহে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে, কোনও দেশ বা ব্যক্তির হুমকির কাছে ভারতকে মাথা নত করতে দেবেন না তিনি। বিদেশের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বদলে তিনি দেশকে আত্মনির্ভর হবার ডাক দিয়েছেন নতুন মন্ত্রে দেশীয় পন্যে 'দাম কম, দম বেশী।'

# ছবিতে খবর

*রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয়, ৬ মুরলিধর সেন লেন, কোলকাতায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।*

*৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে গঙ্গারামপুর পর্যন্ত তিরঙ্গা বাইক র‍্যালিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।*

*ন্যায়বিচারের দাবিতে অভয়ার বাবা-মায়ের আহ্বানে নবান্ন অভিযান। পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জে অভয়ার বাবা ও মা সহ আন্দোলনকারীদের অনেকেই আহত হন।*

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

হরিয়ানার নব নিযুক্ত রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রী অসীম ঘোষ মহাশয়কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাসভবনে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজী'র ঐতিহাসিক জনসভায় মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করে বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

# ছবিতে খবর

*মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী মিত্র'র ভারত-বিরোধী মন্তব্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যা বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি।*

*জেলায় জেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠান শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।*

*বেলগাছিয়া কাশিপুর ও মানিকতলা বিধানসভায় কর্মী সম্মেলনে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী।*

*সল্টলেক কার্যালয়ে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ববৃন্দ।*

*হরিয়ানার নব নিযুক্ত রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রী অসীম ঘোষ মহাশয়-কে শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।*

*২০২৫ সালের ২১ জুলাই বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের দিনে পুলিশের গুলিতে নিহত উলেন রায়ের স্ত্রী মালতী দেবীর পায়ে মাথা ঝুকিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর।*

*হাঁসখালি থেকে সন্দেশখালি, মাটিগাড়া থেকে আর জি কর, কসবা থেকে কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একের পর এক নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে, কন্যা সুরক্ষার দাবিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।*

# ছবিতে খবর













*বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের কনভয়ে পুলিশের সামনে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় সমস্ত কার্যকর্তাদের পথ অবরোধ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি।*






*বাঁকুড়া বুথ সশক্তিকরণ কর্মশালায় দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্মানীয় জেলা নেতৃত্ব।*

*পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে সর্বজনীন দুর্গাপূজা ২০২৫-এর খুঁটি পূজা। মাতৃসঙ্গীত ও আগমনী সুরের মধ্য দিয়ে এই শুভক্ষণে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য, সঙ্গে সম্মানীয় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।*

*ব্যারাকপুর বিধানসভা এবং নোয়াপাড়া বিধানসভার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপির জাতীয় সমিতির সদস্য শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী।*

*ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার মহেশতলা বিধানসভার কার্যকর্তাদের নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী এবং সম্মানীয় জেলা নেতৃত্ব।*

# মালেগাঁও বিস্ফোরণ

## গেরুয়া সন্ত্রাস প্রমাণের এক ব্যর্থ চেষ্টা

**সৌভিক দত্ত**

**দিল্লিতে তখন মনমোহন সিংয়ের সরকার। সরকারের সুতো সোনিয়া গান্ধীর হাতে। দেশ জুড়ে রাতারাতি আছড়ে পড়ল একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা। অযোধ্যা হামলা, দিল্লি সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, বেঙ্গালুরু আইআইএসসি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স) হামলা, বারাণসী সিরিজ বিস্ফোরণ, মুম্বই লোকাল ট্রেন সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, মালেগাঁও বিস্ফোরণে রক্তাক্ত দেশ। আর এই মালেগাঁও বিস্ফোরণ-কে বেছে নেওয়া হয়েছিল- হিন্দুরাও সন্ত্রাসবাদী হয় এই ধারণা মানুষের মাথায় ঢোকানোর জন্য।**

বিগত কিছু দশক ধরে বেশ কয়েকটি ধারণাকে আমাদের মাথায় বারবার প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলেছে, ঠিক ওই সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতে হীরক রাজার মগজ ধোলাই এর কার্যক্রমের মতো। আর সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না। অসংখ্য পোষা কবি সাহিত্যিক কে দিয়ে, বলিউডি সিনেমা ও গানের মাধ্যমে, সরকারি প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে, রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের মাথায় এই মিথ্যে বাক্যটি ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে যে সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু তারা এই কথাটি মানুষকে বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ স্বাভাবিক, সন্ত্রাসের ধর্ম হয়। সন্ত্রাসবাদীর ধর্ম হয়। সন্ত্রাসবাদীরা একটি নির্দিষ্ট ধর্মের আগ্রাসনের জন্যই মানুষ মারে, একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থের কিছু বাক্য মুখস্ত বলতে পারলে সন্ত্রাসবাদীরা প্রাণে না মেরে ছেড়ে দেয়, তাদের মৃত্যুর পর শেষকৃত্য হয় একটি নির্দিষ্ট ধর্মেরই নিয়ম মেনে। এবং তার থেকেও বড় কথা, সেই ধর্মের কোনো ব্যক্তিই কখনোই সন্ত্রাসবাদীদের নিজের ধর্মে অস্বীকার করে না।

প্রমাণ যেখানে এইরকম দিনের আলোর মত উজ্জ্বল সেখানে ধর্মহীন সন্ত্রাসের মগজ ধোলাই করা সম্ভব নয় খুব স্বাভাবিকভাবেই। তাই এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে নেহেরুভিয়ান বাম শিবির অন্য একটি পথ নিয়েছিল তাদের ভোটব্যাংক সম্প্রদায়ের উপর থেকে সন্ত্রাসবাদী তকমা হঠানোর জন্য। আর সেটা হলো, হিন্দুদের উপরেও সন্ত্রাসবাদী তকমা জুড়ে দেওয়া। এবং তার একটা গাল ভরা নামও দেওয়া হয়েছিল - "গেরুয়া সন্ত্রাস"। মানে সেই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটা আরকি, "If you can't convince them, confuse them"! মানুষকে যখনই ধর্মহীন সন্ত্রাসের ব্যাপারে convinced করা গেলো না, তখন তাদের গেরুয়া সন্ত্রাস বলে আসল সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে confused করে দাও। আর এই গেরুয়া সন্ত্রাস শব্দটি মানুষের মাথায় পাকাপোক্তভাবে প্রবেশ করানোর জন্য সংগঠিত নাটকটিই ছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণ।

দিল্লিতে তখন মনমোহন সিংয়ের সরকার চলছে। মানে সবার সামনে মনমোহন সিং, আর তার সুতো সোনিয়া গান্ধীর হাতে। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি সেই সরকারের আনুগত্য গভীর। ফলে রাতারাতি বেড়ে চলল সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম, তাদের ভাষায় ক্রমাগত রক্ত ঝরিয়ে ভারতকে রক্তশূন্য করে দেওয়ার মিশন। সেই সময় কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক ঘটে গিয়েছিল অযোধ্যা হামলা, দিল্লি সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, বেঙ্গালুরু আইআইএসসি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স) হামলা, বারাণসী সিরিজ বিস্ফোরণ, মুম্বই লোকাল ট্রেন সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ তো গেল শুধু বড়সড় সমস্যাগুলোর কথা, ছোটখাটো যে কত কিছু সেই সময় হয়েছিল তা হয়তো শুধু ভগবানই জানেন।

আর এই শেষটি অর্থাৎ মালেগাঁও বিস্ফোরণ-কেই বেছে নেওয়া হয়েছিল- হিন্দুরাও সন্ত্রাসবাদী হয় এই ধারণা মানুষের মাথায় ঢোকানোর জন্য।

*মুম্বই পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে সাধ্বী প্রজ্ঞা-কে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল।*

২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, উত্তর মহারাষ্ট্রের মুম্বই থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মালেগাঁও শহরে এক মসজিদের কাছে বিস্ফোরকযুক্ত একটি মোটরসাইকেল বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে ছয়জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়।

এই বিস্ফোরণে অভিযোগের তির ঘোরানো হয় হিন্দুদের দিকে। গ্রেপ্তার হন সাধ্বী প্রজ্ঞা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিত, অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায়, অজয় রাহিকর, সুধাকর দ্বিবেদী, সুধাকর চতুর্বেদী ও সমীর কুলকার্নি। এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এদের উপর শুরু হয় প্রবল অত্যাচার।

না আমি এই বিস্ফোরণ বা তার পরবর্তী তদন্তকার্যের কোন ধারাবিবরণী লিখব না। বর্তমান ভারতবর্ষের বাচ্চা বাচ্চারাও এই বিষয়ে জানে। তাছাড়া এত ছোট পরিসরে সেটা সম্ভবও না। আমি বরং মূল বিষয়গুলো দেখাই কিভাবে গেরুয়া সন্ত্রাসকে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত প্রসাদ এর সাথে কী করা হয়েছিল, সেটা বললেই হয়তো পুরো এজেন্ডাটা অনেকটা বোঝা যাবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিত সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। সেনাবাহিনীতে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিটি জেহাদি-মাওবাদী ও ভারতীয় কিছু রাজনীতিবিদের মধ্যে নেক্সাসের বিষয় জেনে ফেলেছিলেন তার পদাধিকার বলে। ফলে তাকে সরিয়ে দেওয়াটা কিছু রাজনীতিবিদের কাছে কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কর্নেল পুরোহিতকে ভোপাল বিমানবন্দর থেকে দিল্লি যাবার নাম করে ডেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু বিমানবন্দরে এসে তিনি জানতে পারেন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে মুম্বাইতে। সেখানেই তার মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়, তার বাড়ির লোকেদের সাথে তাকে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাকে নিয়ে এসে মুম্বাই এটিএস নিজেদের হেফাজতে নেয় ২০০৮ সালের

*ষড়যন্ত্রের আর এক নাম 'মালেগাঁও বিস্ফোরণ' কেস।* *ছবি সৌজন্য: দ্য তথ্য*

২৯ অক্টোবর। অথচ অফিসিয়ালি 'অ্যারেস্ট' দেখানো হয় ৫ নভেম্বর। টানা সাত দিন তাকে খাম্বালার একটি বাড়িতে রেখে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। নিদারুন অত্যাচারেও তিনি যখন দোষ মেনে নিতে রাজি হন না তখন তার মা, স্ত্রী ও বোনকে তাঁর সামনে উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হবে বলে হুমকি দেয় এটিএস- এর অফিসাররা। তার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও হুমকি দেওয়া হয় তাকে ভাঙার জন্য।

ঠিক কী আদায় করতে চেয়েছিল তার থেকে সরকার?

প্রধানত আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই মালেগাঁও বিস্ফোরণের সাথে যুক্ত বলে তাকে বলতে বলেছিল তারা। বিশেষ করে যোগী আদিত্যনাথের নাম নেওয়াবার চেষ্টা করা হয়। বিস্ফোরণে তার সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ এটিএস কিংবা পরবর্তী সময়ে এনআইএ দাখিল করতে পারেনি। বিনা প্রমাণে তাঁকে নয় বছর জেলে থাকতে হয়েছিল। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল অভিযুক্ত বাকি সবার সাথেই। সাধ্বী প্রজ্ঞাও একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন বারবার। হেফাজতে থাকাকালীন এটিএস-এর অফিসাররা তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করত। বারবার বলতো রাম মাধব, যোগী আদিত্যনাথ, মোহন ভাগবত, ইন্দ্রেশ কুমারের নাম নিতে। রাজি না হলেই চলত অকথ্য অত্যাচার। অত্যাচারের ফলে প্রজ্ঞা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালেও তাকে পরবর্তীতে বেআইনি ভাবে আটকে রাখা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, এনারা যে সঠিক কথা বলছেন তার প্রমাণ কী? না, তার প্রমাণও আছে। যে কোনও সত্যিই সব সময় ক্রসচেক করে তারপরে গ্রহণ করা উচিত। এখানেও সেটাই হয়েছে। প্রাক্তন এটিএস ইনসপেক্টর মেহবুব মুজাওয়ার নিজের বক্তব্যে সমর্থন করেছেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা। এনআইএ দায়িত্ব নেওয়ার আগে ওই ঘটনার তদন্তভার ছিল মহারাষ্ট্র এটিএসের হাতে। তিনি জানান, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারের জন্য তাঁকে উপরমহল থেকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। ভারতে 'গেরুয়া সন্ত্রাস' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ভাগবতকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ এসেছিল। মুজাওয়ারের বক্তব্যে সরাসরি তুলে দিই, "নির্দেশ এসেছিল পরমবীর সিং ও অন্যান্য উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছ থেকে। আমাকে গ্রেপ্তার করতে বলা হয়েছিল রাম কালসাংগ্রা, সন্দীপ দাঙ্গে, দিলীপ পাটীদার ও আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে। মহারাষ্ট্রে মোহন ভাগবতের প্রভাব বিশাল। তাঁর মতো এক ব্যক্তিত্বকে গ্রেপ্তার করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল..... মালেগাঁও মামলায় যে 'ভুয়ো অফিসার'-এর মাধ্যমে 'সাজানো

*'গেরুয়া সন্ত্রাস' ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক সনিয়া পুত্র রাহুল।*

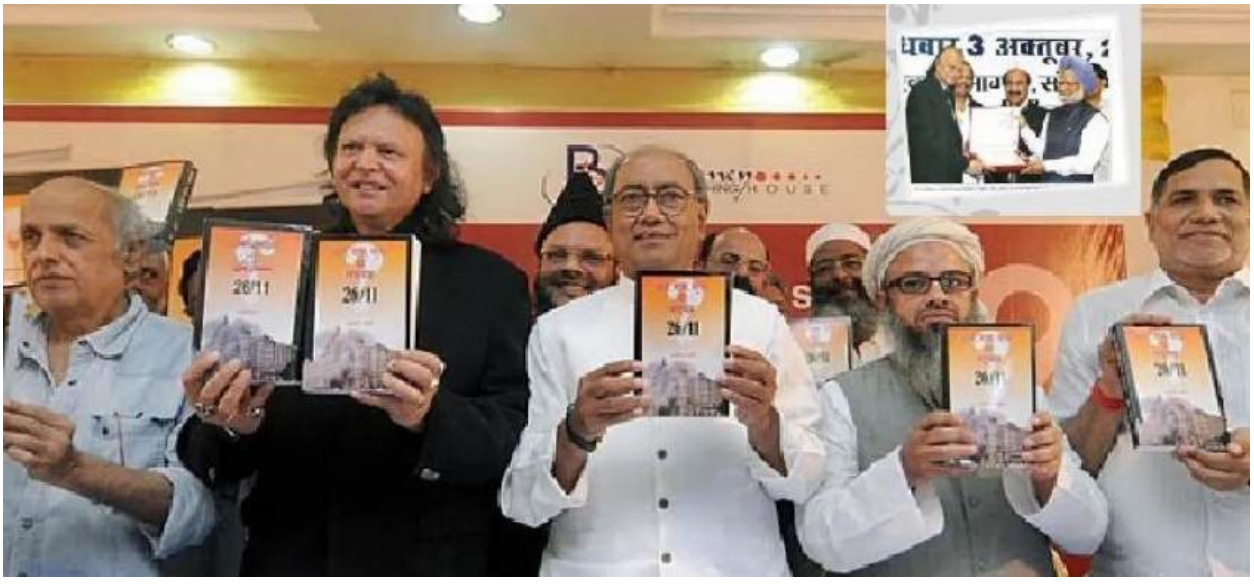


*'গেরুয়া সন্ত্রাস' তত্ত্বের কংগ্রেসি 'তাত্ত্বিক' নেতা দিগ্বিজয় সিং।*

তদন্ত' হয়েছিল, আদালতের রায়েই তা স্পষ্ট। মোহন ভাগবতকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারের নির্দেশ অমান্য করেছিলাম বলে তদন্তকারী অফিসার পরমবীর সিং আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছিলেন। ওরা আমাকে বলেছিল, মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হিসেবে দেখিয়ে চার্জশিট ফাইল করতে। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আইনের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করতে চাইনি। সেই জন্যই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত আমাকে সেই সব মামলায় নির্দোষ বলে রায় দিয়েছিল।"

গেরুয়া সন্ত্রাস প্রসঙ্গে একজন অহিন্দু ব্যক্তির এমন বক্তব্যের পরে আশা করি সারা ভূ-ভারতে আর কারোরই এই বিষয়ে কিছু বলার থাকতে পারে না।

এখানে আরো একটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্তরা যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আমলে অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন তাই বিজেপি বিরোধী ব্যক্তিদের অভিযোগ এই ব্যাপারে তদন্তকার্য ও আদালতকে প্রভাবিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্যাপারে কিছু বলা যাক বরং।

মালেগাঁও ব্লাস্ট কেসের তদন্তভার এনআইএ প্রথম হাতে নেয় ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে। অর্থাৎ কংগ্রেসী ( ইউপিএ ২) জমানায়। তার আগে ২০০৮ থেকে তদন্ত শুরু করে মহারাষ্ট্র এটিএস। তারা তাদের চার্জশীট সাবমিট করে জানুয়ারি ২০০৯-এ। তখনই তদন্তে উঠে আসে মহারাষ্ট্র এটিএস দ্বারা অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের ঘটনা। ফলে আর যদি কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবের কথা তোলে তবে তাদের সবার আগে প্রশ্ন করা উচিত ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কেন ইউপিএ সরকারের অধীনে থাকা এজেন্সিগুলি কিছু প্রমাণ করতে পারলনা? তখনও কি সেখানে মোদি সরকারের প্রভাব ছিল টাইম মেশিনের মাধ্যমে? এবং কিসের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের নিরাপরাধ হওয়ার কথা প্রমাণ হয় সেটাও জেনে নেওয়া যাক।

মহারাষ্ট্র এটিএস এটাই প্রমাণ করতে পারেনি যে ব্লাস্ট হওয়া যে মোটরবাইকটি সামনে রেখে এই সন্ন্যাসিনীকে দোষী সাজানো হয়েছিল সেই বাইকটি আসলেই ওনার কিনা। অর্থাৎ গোড়াতেই গলদ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রজ্ঞা বিস্ফোরণের ঘটনার দু'বছর আগেই সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আবার একইভাবে এটিএস কর্ণেল পুরোহিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল যে তিনি তার বাড়িতে এই বিস্ফোরক মজুত করেছিলেন, তারও কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। ৩১ জুলাই এনআইএ আদালত লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিতকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।

অর্থাৎ যে দুইটি পয়েন্টের ভিত্তিতে গেরুয়া সন্ত্রাসের তত্ত্ব সাজানো হয়েছিল, দুইটিরই কোনো প্রমাণ ২০০৮ থেকে ২০১৪ এর ভেতর কোনো এজেন্সি দিতে পারেনি। অগত্যা এনাদের ছাড়া পাওয়া ও ওই বিস্ফোরণ কান্ডে হিন্দুদের যুক্ত থাকা অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তা সে কেন্দ্রে যে সরকারই থাকুক না কেন।

বেশি কিছু আর বলার নেই। বাটলা হাউসে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য যারা চোখের জল ফেলেছিল তাদের সরকারের আমলে যে হিন্দুদের টার্গেট করে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা স্বাভাবিক নয় যে সত্যের পরাজয় হবে। সত্যমেব জয়তে। আর সেটাই হয়েছে এখানে। এবং চিরদিনই এটাই হবে।

শুধু আমাদের এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে, অন্য কোথাও আর কোনো হিন্দু বিরোধী সরকারই যেন গেরুয়া সন্ত্রাস নিয়ে নতুন কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে। গেরুয়া সন্ত্রাস বলে কিছু হয় না। হিন্দুরা কখনো সন্ত্রাসবাদী হয় না। কারণ হিন্দুদের নিজেদের দেশে হিন্দুরা কখনো সন্ত্রাস ছড়াতে পারে না। নিজের বাড়ির, নিজের পরিবারের ক্ষতি কেউ কোনোদিন করতে পারে নাকি? নাকি সেটা করা সম্ভব?

# অবশেষে বাম 'শাপ' মুক্ত

## পাঠ্যপুস্তকে বিদেশী প্রভাব

**দিব্যেন্দু দালাল**

**ভারতবর্ষ-ই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে বাম-কংগ্রেসের শাসনকালে দেশের ইতিহাসকে অবহেলা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বিদেশী মুসলমান শাসকদের ইতিহাস যারা আক্রমণ করেছিল এ দেশ। অদ্ভুত কাণ্ড! একজন ভারতীয় শিশুর কাছে কোন ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ? ঋগ্বেদের পরিবেশ চিন্তা, আর্যভট্টের বিজ্ঞান, উজ্জয়িনী বা চোল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নাকি 'বর্বর' বাবরের ধারাবিবরণী!**

শিক্ষার 'গৈরিকীকরণ' নিয়ে মাঝে মধ্যেই দেখা যায় কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ সরব হয়ে ওঠেন। ওনারা মনে হয় ভুলে যান যে ক্ষমতার অলিন্দে থাকাকালীন ওনারা কী সুন্দর ভাবে নিজেদের মত করে ইতিহাস রচনা করে গেছেন। খুব বেশী দিন আগের ঘটনা নয়, এই ধরুন ২০০৭ সালের আগে যেখানে এনসিইআরটির দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ১২৫০ শব্দের লেখা ছিল সেটিকে কমিয়ে মাত্র ৩৭ শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয় এবং অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে একেবারেই মুছে ফেলা হয়! চন্দ্রশেখর আজাদ, আশফাকুল্লা খান, বটুকেশ্বর দত্ত, রামপ্রসাদ বিসমিলের মত ৩৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ইতিহাস বই থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলা হয়!

একই ভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়েও একই রকমের উদাসীনতা দেখানো হয়েছিল। ২০০৭ সালের আগে অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে নেতাজির ওপর যেখানে ৫০০ শব্দ খরচ করা হয়েছিল এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বইতে ১২৫০ শব্দ খরচ করা হয়েছিল সেখানে পরবর্তীকালে নেতাজির ওপর দ্বাদশ শ্রেণীতে মাত্র ৮৭ শব্দ খরচ করা হয়েছে আর অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে ইউপিএ আমলে কি রকম সুপরিকল্পিত উপায়ে ভারতের প্রকৃত দেশনায়কদের নতুন প্রজন্মের মন থেকে বিস্মৃত করার চেষ্টা হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্যের ইতিহাস যেমন চোল, বিজয়নগর, অহোম প্রভৃতিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতের নতুন প্রজন্মের দেশের প্রকৃত ইতিহাসের কথা জানার কোন অধিকার নেই কি? এদেশের ছাত্রছাত্রীরা জানবে না কিভাবে লচিত বরফুকনের নেতৃত্বে অহোম রাজবংশ মুঘল আক্রমণ থেকে অসমকে রক্ষা করেছিল? তাও একবার নয়, ১৭ বার! তারা জানবে না চোল সাম্রাজ্য কিভাবে দক্ষিণে সুদূর মালদ্বীপ থেকে উত্তরে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল! ১৬০০ বছরের চোল সাম্রাজ্য বা ৬০০ বছরের অহোম রাজত্বকাল কোন দিক দিয়ে মেসোপটেমিয়া বা মিশরীয় বা ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ সেটা ওনারা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন? এদেশের নব প্রজন্মের কাশ্মীরের প্রবল প্রতাপশালী রাজা ললিতাদিত্যের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানার কি অধিকার নেই? যারা ইতিহাসের গৈরিকীকরণ নিয়ে সরব তারাই এক সময় এনসিইআরটি-এর পাঠক্রমে নির্লজ্জের মত নিজেদের এজেন্ডা চালিয়ে গেছে। তাদের কাছে প্রশ্ন রাখি, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস চর্চাকে আর কতদিন দক্ষিণপন্থীদের 'গৈরিকীকরণ' বলে প্রচার চালাবেন?

বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন না আনতে পারলে ঔপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত হয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করা অসম্ভব। এই কথা মাথায় রেখেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তৈরী করা হয়। এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি তৈরী হয় যা ঔপনিবেশিকতার ছায়া থেকে সরে ভারতীয় পরম্পরার ওপর বল দেওয়ার পথ অবলম্বন করে। এরই ফলস্বরূপ এনসিইআরটি-এর পাঠক্রমে পরিবর্তন আনা হতে শুরু করেছে। নতুন পাঠক্রম কেমন হবে তার একটা ধারণা দিতে ষষ্ঠ শ্রেণীর নবনির্মিত পাঠ্যবইয়ের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে তার কিছু উদাহরণ দিলাম।

**এনসিইআরটি-এর ষষ্ঠ শ্রেণীর সোশ্যাল সায়েন্সের-এর নবনির্মিত পাঠ্যবইয়ের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য: এক ঝলকে**

*চোল নৌবাহিনীর ইতিহাস ভারতের গৌরবময় অধ্যায়।*

**১. ঋগ্বেদ থেকে শুরু, পরিবেশচিন্তার স্বরূপ**

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে অথর্ব বেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যা প্রমাণ করে-ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে হাজার হাজার বছর আগেই পরিবেশ ও পৃথিবী রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

এটি শুধুমাত্র পরিবেশচেতনার এক শাশ্বত বার্তাই নয়, বরং স্পষ্ট ঘোষণা: পরিবেশরক্ষা কোনও আধুনিক বা পাশ্চাত্য ধারণা নয়— এটি আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশ।

**২. আর্যভট্টের বাণী দিয়ে সূচনা**

"পৃথিবীর অবস্থান ও গোলাকৃতি"—এই জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান আসার বহু পূর্বেই ভারতবর্ষের জ্ঞানতীর্থে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম অধ্যায়েই আর্যভট্টের (খ্রিস্টীয় ৫০০ সাল) একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বইটি স্বীকৃতি দিয়েছে সেই প্রাচীন বিজ্ঞানমনস্কতাকে।

**৩. মধ্যরেখা ও উজ্জয়িনী: ভারতীয় সময়গণনার গৌরব**

'ডোন্ট মিস আউট' অংশে বলা হয়েছে, ইউরোপের গ্রিনউইচ মেরিডিয়ান আসার বহু আগেই ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রধান দ্রাঘিমারেখা ছিল—মধ্যরেখা, যা উজ্জয়িন দিয়ে অতিক্রম করত।

উজ্জয়িনী সেই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, যেখানে বীর্যবান বিজ্ঞানী বরাহমিহির কর্মরত ছিলেন। এইসব তথ্য সাধারণত ঐতিহ্যস্থলে যাওয়া ছাড়া পাওয়া যায় না—তাই একে পাঠ্যবইতে স্থান দেওয়া এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

**৪. উত্তর বা দক্ষিণ নয়—এ তো একটাই ভারত!**

ভৌগোলিক দিকনির্দেশনার পেছনে সাংস্কৃতিক বিভাজনের রাজনীতি নেই। ভারতবর্ষ এক ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক অঞ্চল, তা সে উত্তরের হোক বা দক্ষিণের।

**৫. "ভারত" নামের উৎপত্তি: ভাষার বিবর্তনের সাক্ষ্য**

আমাদের নিজের ছিল-ভারত, আর্যাবর্ত, সপ্তসিন্ধু।

'হিন্দ' শব্দটি এসেছে পারসিকদের কাছ থেকে—যারা 'সিন্ধু' নদীকে উচ্চারণ করত 'হিন্দু'। সেখান থেকেই 'হিন্দ' ও পরে 'ইন্ডিয়া' শব্দের জন্ম। তবে এই বিবর্তনের মধ্যেও মূল পরিচয় ছিল আমাদের নিজের— এক বিস্তৃত, সজীব, বহুধা সংস্কৃতির নাম "ভারত"।

**৬. সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চা**

বিবি লালের মতো প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাজ বোঝায়—যখন মাটি ও সত্যের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃত গবেষকরা ইতিহাস লেখেন, তখন তা হয় গর্বের বিষয়। এটি কেবল তথ্য নয়-এটি এক সভ্যতাগত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

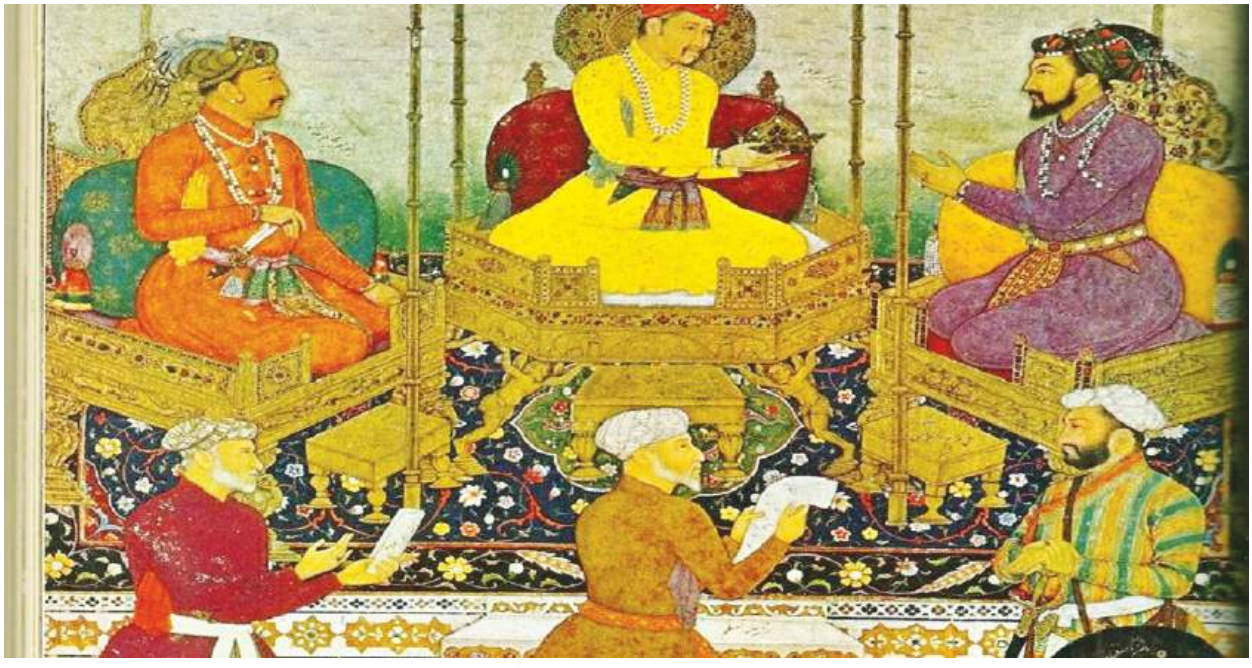

*'বাম-পন্থী' বাবর-আকবরদের জমানা শেষ*

**৭. মহাভারতের ইরুলা স্মৃতি: দক্ষিণ ভারতের উত্তরাধিকার**

তামিলনাড়ুর ইরুলা আদিবাসীরা শিলালিপিতে সংরক্ষণ করেছেন পাণ্ডবদের কাহিনি।

এতে প্রমাণ হয়, দক্ষিণ ভারতও মহাভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাঁরা দাবি করেন দক্ষিণের সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের বাইরে— তাঁরা আদিবাসীদের জীবিত স্মৃতিকে অস্বীকার করেন।

প্রশ্ন উঠে— আদিবাসীরা বেশি শিকড়বদ্ধ, না বুদ্ধিজীবী এলিটরা?

**৮. তিরুবল্লুভর ও তিরুক্কুরল: ধর্ম ও নৈতিকতার তামিল কাব্য**

তিরুবল্লুভর— তামিল ভাষার মহান দার্শনিক ও কবি, যিনি তিরুক্কুরল রচনা করেছেন।

পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে তাঁর বাণীকে পাঠ্যবইতে স্থান দেওয়া এক মার্জিত পদক্ষেপ।

**৯. মহাভারতের উদ্ধৃতি: সভ্যতার আয়নার মতো**

আমাদের মহাকাব্য— মহাভারতের ভাবনা ও শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। পাঠ্যবই সেই শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

**১০. বাস্তব নায়কদের গল্প: আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ**

এক সময় পাঠ্যবইয়ে স্থান পেত বহিরাগত ব্যক্তিত্ব যাঁরা ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আত্মিক সংযোগহীন। এখন উঠে এসেছে সেই নায়কেরা, যাঁদের জীবন ও কীর্তির সঙ্গে আমরা বাস্তবে সংযুক্ত।

**১১. প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা: বাস্তব উন্নয়নের চিত্র**

সরকারি প্রকল্প কেবল পরিসংখ্যান নয়—গ্রামের সড়ক মানে স্কুলে পৌঁছানো, বাজারে পণ্য বিক্রি, হাসপাতালে পৌঁছানোর পথ। এটা বাস্তব উন্নয়ন, এবং এই উপলব্ধি ছাড়াও অর্থনীতি বোঝা অসম্ভব।

**১২. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র: প্রশাসনের প্রাচীন শিখর**

চাণক্য বা কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'-এ যে প্রশাসনিক কাঠামো তুলে ধরেছেন, তা আজও শিক্ষণীয়।

এখন ছাত্ররা বুঝতে পারবে—গভর্নেন্স মানে কেবল ব্রিটিশ অনুকরণ নয়, তা আমাদের মজ্জাগত।

**১৩. শাড়ি পরা কর্মজীবী নারী: বাস্তবের মুখচ্ছবি**

শাড়ি পরা মানেই 'অশিক্ষিত' নারী নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নারী তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যিক পোশাকেই শিক্ষিকা, ব্যাংকার বা প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করছেন।

এটি সামাজিক বাস্তবতা, যা পাঠ্যবইয়ে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

**১৪. ধনী হওয়া মানে শত্রু নয়— অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন**

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে সম্পদ মানেই শোষণ, সেখানে কৌটিল্য বলেন—"সমৃদ্ধির মূল হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ"।

ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হচ্ছে, দারিদ্র্য গৌরব নয়, উন্নয়নই প্রয়োজন। বিত্ত অর্জনকে ঘৃণা না করে, তা সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে।

এই পাঠ্যবই কেবল একাডেমিক জ্ঞান নয়, বরং এটি এক সভ্যতার পুনর্জাগরণ। যেখানে ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ধর্ম ও নৈতিকতা— সব কিছুই আমাদের নিজস্ব শিকড় থেকে উৎসারিত। এটি কেবল শিক্ষা নয়-এ এক আত্মপরিচয়ের পাঠ। এই নতুন পাঠক্রম এই দেশকে 'ইণ্ডিয়া' থেকে 'ভারত'-এর পথে উত্তরণের মার্গ প্রশস্ত করবে বলে আশা রাখি।

# ট্যারিফের হুমকিতে
# ঝুঁকবে না নরেন্দ্র মোদীর ভারত

**অভিরূপ ঘোষ**

**পৃথিবীতে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র এখন আর আমেরিকা কেন্দ্রিক এক মুখী নয়, বহু মুখী। সোভিয়েত রাশিয়া পতনের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, পতনের পর আরও দ্রুত বদলে গেছে পৃথিবী। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া, ভারত, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন- সকলেই একে অন্যের পরিপূরক বহুমুখী বিশ্ব অর্থনীতিতে। আমেরিকা নয়, ট্রাম্পের অলীক বুদ্ধি-বিবেচনা এটা মানতে পারছে না। এর ফলে তার বালখিল্যসুলভ ভয় দেখানো ভারতকে। আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করছে আমেরিকা। এটা নতুন ভারত। এই ভারত ঝুঁকবে না।**

প্রথমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষনা করলেন ভারতের পণ্যসামগ্রী এবং পরিষেবার উপর পঁচিশ শতাংশ ট্যারিফ বসাবে আমেরিকা। সাথে হুঁশিয়ারি দিলেন রাশিয়া থেকে ভারত তেল কিনলে করের পরিমাণ আরো বাড়বে। পরদিন অসমর্থিত সূত্রে কানাঘুসো শোনা গেল ভারতের বিভিন্ন তেল কোম্পানিগুলি নাকি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বেজায় খুশি। ভাবলেন আমেরিকা হুমকি দিয়েছে আর তাতেই ভয়ে রাশিয়া থেকে কাঁচা তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। ট্রাম্প সাহেবের এ আনন্দ যদিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ভারতের সরকারি তেল সংস্থাগুলো জানিয়ে দিল তারা রাশিয়া থেকে যেভাবে কাঁচা তেল কিনছিল সেভাবেই কেনা চালিয়ে যাবে। প্রবল ক্ষমতাধর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি গেলেন রেগে। এত বড় সাহস একটা উন্নয়নশীল দেশের যে তারা আমেরিকার কথা শুনে চলছে না! অতএব বাড়াও ট্যারিফ। এবার ৫০ শতাংশ। রাষ্ট্রপতি সাহেব ভাবলেন ভারত হয়তো এবার ভয় পেয়ে মাথা নোয়াবে। কিন্তু সে গুড়েও বালি। ট্রাম্পের হুমকির তোয়াক্কা না করে রাশিয়া থেকে তেল কেনা ভারত একটুও কমায়নি।

এখানে বলে রাখা দরকার রাশিয়া থেকে কাঁচা তেল ভারত কেনে শুধু দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে নয়। এখানে আম ভারতীয়ের স্বার্থ ব্যাপকভাবে জড়িয়ে। রাশিয়া ইউক্রেন বিবাদ শুরু হবার পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে তেল ভারতে আসতো তার একটা অংশ ইউরোপের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। রাশিয়া তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে ভালো পরিমানে ছাড় দিয়ে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করে। ভারতে পেট্রোল ডিজেল সমেত বিভিন্ন প্রকার তেলের চাহিদা যেহেতু ব্যাপক তাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এই সুবিধা লুফে নিই আমরা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যা দাম তার থেকে বেশ কিছুটা ছাড়ে রাশিয়া তেল দিতে আরম্ভ করে ভারতকে। বস্তুতঃ এই কারণেই শেষ কয়েক বছর পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন সমেত কোনোরকম জ্বালানি তেলেরই দাম বাড়েনি আমাদের দেশে। আর এখন আমেরিকা চাইছে ভারত রাশিয়া বা ইরান থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিক আর মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ বেড়ে যাক আমাদের দেশে। তাই এই চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

যদিও এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। রাশিয়া থেকে তেল কেনা যাবে না এরকম হুমকি আমেরিকা ভারতকে দেবার পর

*কূটনৈতিক দূরত্ব কমছে ভারত-চিনের! ট্রাম্পের মাথাব্যাথা।*

আমাদের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে। সেখানে তথ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে জানানো হয় কিভাবে আমেরিকার যুদ্ধসঙ্গী ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে বেমালুম ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা ভারতকে হুমকি দেওয়া আমেরিকা খোদ নিজেরাই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার সাথে। নিউক্লিয়ার শক্তির জন্য ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড, ব্যাটারি চালিত গাড়ির জন্য প্যালাডিয়াম সহ বিভিন্ন কৃষিজ সার এবং অন্যান্য আরো অনেক সামগ্রী আজকের দিনে দাঁড়িয়েও রাশিয়া থেকে আমদানি করছে আমেরিকা। আন্তর্জাতিক মহলে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যেখানে আমেরিকা এবং তার যুদ্ধসঙ্গী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে হঠাৎ করে (হঠাৎ, কারণ তেল কেনার এই বিষয়টা নতুন নয় এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়েছে সেটাও বেশ অনেকদিন হয়ে গেল) তারা ভারতকে ব্যবসা বন্ধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে কেন! এর সরাসরি উত্তর একমাত্র আমেরিকা দিতে পারত। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং উত্তর এড়িয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর যেখানে প্রতিটি বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট সক্রিয় সেখানে নিজেরা যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করে ভারতকে দমন করার এই চেষ্টা নিয়ে তারা একেবারে নীরব।

*ব্রিকসের শক্তিবৃদ্ধিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে 'মার্কিন দাদাগিরি'*
*(ফাইল চিত্র, ব্রিকস সম্মেলন, ২০১৬ সাল)।*

### প্রশ্ন হল কেন আমেরিকা হঠাৎ করে এরকম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে!

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এর কারণ বিবিধ। সাম্প্রতিক অতীতে বাণিজ্য সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয় ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ওই মিটিংগুলিতে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার দখলের জন্য চাপ দেয় আমেরিকা। আমেরিকান এয়ারলাইন্স বা ওয়ালমার্টের মত বড় কোম্পানি যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল তারা ভারতের বাজার দখল করতে এমন কিছু সুবিধা চায় যা ভারত সরকার দিতে রাজি হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা

বহির্বাণিজ্য ভারতের কাছে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তা কোনদিনই ভারতের সাধারণ শ্রমিক-কৃষক বা কর্মচারীদের স্বার্থ লঙ্ঘন করে নয়। তাই দেশীয় বাজারের ক্ষতি করে বিদেশি শক্তিকে সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবে সরাসরি না করে দেয় ভারত সরকার। অনেকে মনে করেন রাগের মূল কারণ এটাই।

এছাড়া বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মত অস্ত্র ব্যবসার বাজারের ক্ষেত্রে দিনে দিনে ভারত আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সাম্প্রতিক গতিতে আমাদের দেশ আমেরিকার সঙ্গে খুব একটা বেশি অস্ত্র চুক্তি করেনি। বদলে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে অনেক

*ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র বড় বন্ধু রাশিয়া।*

বেশি। কারণ অবশ্যই বেটার কোয়ালিটি আর তুলনামূলক কম দাম। তার চেয়েও বড় কথা আমদানির উপর ভরসা না করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজেরাই অস্ত্র তৈরিতে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নিতে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত যে ১০০ শতাংশ সঠিক ছিল তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক অপারেশন সিঁদুরের সময়। পাকিস্তান শত চেষ্টা করেও ভারতের মাটিতে ন্যূনতম আঁচড় ফেলতে পারেনি। সৌজন্যে রাশিয়ার এস৪০০ এবং ভারতের আকাশ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল। অন্যদিকে চিনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আমেরিকার ফাইটার জেটের নজর এড়িয়ে বেশ অনেকবার পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঠিকানায় আঘাত হানে ভারত। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের মত (এবং বায়ুসেনা প্রধানের সাংবাদিক সম্মেলন সেদিকেই ইঙ্গিত করছে) যে অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে সরাসরি আকাশযুদ্ধ হয় তাতে আমেরিকা থেকে কেনা পাকিস্তানের এফ১৬ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতের নিজস্ব এবং রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি ফাইটার জেটের দৌলতে। শোনা যাচ্ছে ভারতের হাতে এই পর্যুদস্ত হওয়া দেখে নাকি স্পেন সমেত বেশকিছু রাষ্ট্র আমেরিকার সাথে অস্ত্রচুক্তি থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। বদলে কিছু কিছু দেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উপর, যা আজ থেকে দু দশক আগেও ভাবা অসম্ভব ছিল। ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন ভারত সরকার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে আরো পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশি লগ্নী করবে। এসব ঘটনা রাতের ঘুম উড়িয়েছে আমেরিকা সমেত সেই সমস্ত দেশের যাদের কাছে এক সময় ভারত অস্ত্র বিক্রির একটা বড় বাজার ছিল।

এছাড়াও শেষ কয়েক বছরে ডলারের উপর নির্ভরতা কমাতে নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকাঠামো শক্ত করার দিকে নজর দিয়েছে ভারত। ভারতের যুগান্তকারী ইউপিআই সিস্টেম গ্রহণ করেছে বেশ কিছু দেশ। মধ্যপ্রাচ্য সমেত বেশ কিছু জায়গার কয়েকটি রাষ্ট্র ডলারের পরিবর্তে সরাসরি রুপি বা টাকাতে চুক্তি করছে ভারতের সাথে। ভারতের উদ্যোগেই ব্রিকস দেশগুলি নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য ডলারের পরিবর্তে নিজস্ব মুদ্রা তৈরিতে উদ্যোগ নিতে আরম্ভ করেছে সাম্প্রতিক সময়ে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে গোটা পৃথিবীর উপর দাদাগিরি দেখানো আমেরিকার প্রভাব বেশ কিছুটা খর্ব হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ফলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে শুরু করে দেওয়া আমেরিকা এবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে চাপ দিয়ে ভারতকে আবার আগের মতো আমেরিকার উপর নির্ভরশীল করে নেওয়া যায়। তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মত এ যাত্রায় আমেরিকার সফল হওয়া সম্ভাবনা প্রায় নেই। কারণ এটা নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত। আমাদের মাথায় রাখতে হবে নরেন্দ্র মোদী হলেন সেই ব্যক্তিত্ব যাকে একসময় ভিসা দিতে অস্বীকার করা আমেরিকা পরবর্তীতে রেড কার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন এই নতুন ভারত বন্ধুকেও ঝুঁকতে বলবে না আর নিজেও ঝুঁকবে না। ছোট বড় সব দেশের সাথেই কথা হবে চোখে চোখ রেখে, সমানে সমানে। মোদি সরকার 'রাষ্ট্র সর্বোপরি' নীতিতে বিশ্বাসী। এখানে যত চাপই আসুক দেশের মানুষের নূন্যতম ক্ষতি হবে এমন পদক্ষেপ সরকার আগেও কোনদিন নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও নেবেনা। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করছে আমেরিকা। এটা নতুন ভারত। এই ভারত ঝুঁকবে না।

*সংসদের উভয় কক্ষের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।*

*ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শিবু সোরেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নয়াদিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।*

*বিহারের সীতামাড়ি-তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের জনসভায় মা-বোনেদের উৎসাহের ঢেউ।*

# দুর্গাপুজোয় বড় উপহার

## পশ্চিমবঙ্গের ঘরে-ঘরে এবার সরাসরি পাইপ লাইনে প্রাকৃতিক গ্যাস

- পুজোর আগেই **কল্যাণীর পুর এলাকায় পরিষেবা শুরু**
- ইতিমধ্যেই কল্যাণীতে **তৈরী হয়েছে মাদার গ্যাস স্টেশন**
- ডিসেম্বরের মধ্যেই **উত্তর ব্যারাকপুর, নৈহাটি** সহ **বিস্তীর্ণ এলাকায়** পৌঁছে যাবে **পাইপলাইন গ্যাস**

## মোদীজির উদ্যোগে এবার কমবে দূষণ এবং রান্নার খরচেও হবে সাশ্রয়

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।